# আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৮

MARTYRS' DAY

INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY 2018

## আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

১৫ মার্চ ২০০১ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি এ. আনান

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

ফে ব্রু য়া রি

# শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৮

## স্মরণিকা

**আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)**

ইউনেস্কো ক্যাটিগরি-২ ইনস্টিটিউট

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ১/ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

**প্রকাশকাল** : ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ | ৯ ফাল্গুন ১৪২৪

**স্বত্ব:** আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

**সম্পাদক** : অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী
**নির্বাহী সম্পাদক** : শেখ মোঃ কাবেদুল ইসলাম
**অঙ্গসজ্জা ও অলঙ্করণ** : মোঃ শাহীনুর রহমান
(নির্দেশনা: নির্বাহী সম্পাদক)

**স্মরণিকা উপকমিটি**

| | | |
|---|---|---|
| ১. | শেখ মোঃ কাবেদুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব ও পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা), আমাই | আহ্বায়ক |
| ২. | ড. মোঃ মহিউদ্দিন, পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ), আমাই | সদস্য |
| ৩. | ভীষ্মদেব চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | সদস্য |
| ৪. | অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান, চেয়ারম্যান, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | সদস্য |
| ৫. | মাহবুবুর রহমান, যুগ্মসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ৬. | দেবদুলাল ভট্টাচার্য্য, উপপরিচালক (উপসচিব), প্রশাসন ও অর্থ, আমাই | সদস্য |
| ৭. | মো. কামরুজ্জামান ভূঞা, উপপরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ৮. | সঞ্জীব দ্রং (লেখক, গবেষক ও সমাজকর্মী) | সদস্য |
| ৯. | সাজিয়া আফরীন, সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন ও সংস্থাপন), শিক্ষা মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ১০. | স্বপন কুমার নাথ, উপপরিচালক (গবেষণা ও তথ্যায়ন), জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নাগেম) | সদস্য |
| ১১. | ড. অশোক কুমার বিশ্বাস, সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা), আমাই | সদস্যসচিব |

**মুদ্রণ:** পঞ্চতারকা প্রিন্ট মিডিয়া, কাটাবন, ঢাকা

**আবুল বরকত:** শহীদ আবুল বরকতের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার ভরতপুর থানার বাবলা গ্রামে। ১৯২৭ সালের ১৬ জুন তাঁর জন্মদিন। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে আইএ পাস করে পূর্ববাংলায় চলে আসেন ১৯৪৮ সালে। এই বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৫১ সালে অনুষ্ঠিত বিএ অনার্স পরীক্ষায় ২য় শ্রেণিতে ৪র্থ স্থান অধিকার করেছিলেন। শহীদ বরকত ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে এসেছিলেন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। সেখানেই তিনি পুলিশের গুলিতে গুরুতর আহত হন। অত্যধিক রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়। বহু কষ্ট করে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে, পরে আজিমপুর গোরস্থানে দাফন করা হয়।

**রফিকউদ্দিন আহমদ:** শহীদ রফিকের জন্ম ১৯২৬ সালের ৩০ অক্টোবর, মানিকগঞ্জের সিংগাইর থানার পারিল গ্রামে। তাঁর বাবার নাম আবদুল লতিফ, মা রাফিজা খাতুন। শহীদ রফিক বাবার প্রথম সন্তান। তাঁর পিতার প্রেস ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তিনি মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজে বাণিজ্য বিভাগে অধ্যয়ন করতেন। শহীদ রফিকের বিবাহের দিন ধার্য হয় ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই। কন্যার নাম পানুবিবি। ২১ ফেব্রুয়ারিতে প্রথমে শোনা যায় ৩ জন ছাত্র মারা গেছে। শহীদ রফিকের ভগ্নীপতি মোবারক আলী খানের মাধ্যমে জানা যায় শহীদ রফিকের মাথায় গুলি লেগেছে। গুলির আঘাতে শহীদ রফিকের মগজ বেরিয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়ে বলেও শোনা যায়।

**শফিউর রহমান:** ১৯১৮ সালের ২৪ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার কোন্নগর গ্রামে শহীদ শফিউর রহমানের জন্ম। ১৯৪৫ সালের ২৮ মে কলকাতার তমিজউদ্দিন আহমদের কন্যা আকিলা খাতুনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। দেশবিভাগের পর পিতা মাহবুবুর রহমান ঢাকায় চলে আসেন। পড়াশোনার পাশাপাশি শহীদ শফিউর রহমান ঢাকা হাইকোর্টে কেরানি পদে চাকরি করতেন। ২২ ফেব্রুয়ারি শফিউর রহমান সাইকেলে অফিসে যাওয়ার পথে নবাবপুর রোডে ভাষার দাবিতে আন্দোলনরত মিছিলে পুলিশ গুলি করলে তিনি গুলিবিদ্ধ হন। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দিলেও তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। অতিকষ্টে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তাঁকে আজিমপুর গোরস্থানে দাফন করা হয়।

**আবদুল জব্বার:** শহীদ আবদুল জব্বারের জীবন প্রকৃত অর্থেই বৈচিত্র্যময়। আর্থিক কারণে পঞ্চম শ্রেণির বেশি লেখাপড়া করতে পারেননি, তবে মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া তাঁর স্বভাবে ছিল এবং এভাবেই জন্মভূমি গফরগাঁও ছেড়ে নারায়ণগঞ্জে এসে এক সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি চলে যান বার্মায় (বর্তমান মায়ানমার)। প্রায় ১২ বছর বার্মায় কাটানোর পর দেশে ফিরে আসেন। বিয়ে করেন আমেনা খাতুনকে। পাকিস্তানের প্রতি তাঁর ছিল চরম বিতৃষ্ণা। তিনি পাকিস্তানকে 'ফাকিস্তান' বলে উপহাস করতেন। শহীদ জব্বার শাশুড়ির চিকিৎসা করাতে তাঁকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল প্রাঙ্গণে ভাষা আন্দোলনের সমাবেশে হাজার হাজার বাঙালি অংশ নিলে তিনিও তাতে অংশ নেন। পুলিশ গুলি চালালে যাঁরা শহীদ হন, আবদুল জব্বার তাঁদের অন্যতম।

**আবদুস সালাম:** শহীদ আবদুস সালাম অর্থাভাবে বেশি দূর লেখাপড়া করতে পারেননি। ফেনীর দাগনভূঁইঞার উপজেলার লক্ষ্মণপুর গ্রামে তাঁর জন্ম, ১৯২৫ সালে। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ ফাজিল মিয়া। শহীদ আবদুস সালাম দাগনভূঁইঞা কামাল আতাতুর্ক হাইস্কুলে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন। চাকরির সন্ধানে ঢাকায় এসে সরকারের ডিরেক্টরেট অব ইন্ডাস্ট্রিজে পিয়ন পদে চাকরি পান। ঢাকায় তিনি ৩৬/বি নীলক্ষেত ব্যারাকে বাস করতেন। ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারিতে প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করলে ছাত্র-জনতা সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। শহীদ আবদুস সালাম তাতে অংশ নেন। বিক্ষোভে পুলিশের গুলিতে গুরুতর আহত হলে তাঁকে ঢাকা মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর লাশ আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়।

**আবদুল আউয়াল:** শহীদ আবদুল আউয়াল পেশায় একজন রিকশাচালক। তিনি শহীদ হন ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যখন ছাত্র বিক্ষোভ চলছিল, তখন আবদুল আউয়াল সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর বয়স ছিল ২৬ বছর। পিতা মোহাম্মদ হাশিম। সে সময় শহীদ আউয়ালের ঢাকার ঠিকানা ছিল ১৯, হাফিজুল্লাহ রোড।

**অহিউল্লাহ:** শহীদ অহিউল্লাহ ছিলেন ৮/৯ বছরের বালক। তাঁর পিতা হাবিবুর রহমান, পেশায় রাজমিস্ত্রী। ১৩৫৮ সালের ১১ই ফাল্গুন সাপ্তাহিক নতুন দিন পত্রিকার সংবাদে জানা যায়, ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি নবাবপুর রোডে খোশমহল রেস্টুরেন্টের সামনে অহিউল্লাহ মাথায় গুলিবিদ্ধ হন। পুলিশ দ্রুত তাঁর লাশ অকুস্থল থেকে সরিয়ে নেয় এবং গায়েব করে দেয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

**রাষ্ট্রপতি**
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

০৯ ফাল্গুন ১৪২৪
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

# বাণী

উনিশশ' বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি মহান ভাষা আন্দোলনে অমর শহিদদের আত্মার প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা। তাঁদের অপরিমেয় রক্তের বিনিময়ে অর্জিত ২১শে ফেব্রুয়ারি আমাদের শহিদ দিবস আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃত। বস্তুত ভাষা আন্দোলন থেকেই বাঙালির আত্ম-অন্বেষণের শুরু। ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই এসেছে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রাম। ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগই আমাদের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জনে উদ্বুদ্ধ করেছে। আর সে সংগ্রামের রক্তপিছল পথেই এসেছে আমাদের স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা আমাদের দিয়েছে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মুক্তি। সাংস্কৃতিক আন্দোলন থেকে একটি জাতির মুক্তির বিষয়টি সারা বিশ্বের জন্য বিস্ময়কর। মায়ের ভাষার আন্দোলন রূপান্তরিত হয়েছিল মাতৃভূমির স্বাধীনতার সংগ্রামে। সেটা শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, সারা বিশ্বের শোষিত মানুষের মুক্তি সংগ্রামের অনুপ্রেরণা।

জাতিসংঘ কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি, মাতৃভাষার দাবিতে ভাষা শহিদদের রক্তদানকে বিশ্বজুড়ে মহিমান্বিত করেছে। পৃথিবীর বিপন্নপ্রায় ভাষাসমূহের সংরক্ষণ, বিকাশ ও ভাষার গবেষণার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিষ্ঠা করেছেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। এর মাধ্যমে তিনি সারা পৃথিবীর ভাষার সংরক্ষণ ও বিকাশের পথকে করেছেন উন্মুক্ত।

ভাষার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ থেকে বেরিয়ে পৃথিবী আজ মাতৃভাষা-আশ্রয়ী শিক্ষার দিকে ধাবমান। প্রতিটি শিশু তার মাতৃভাষায় শিক্ষাগ্রহণ করবে এটা তার অধিকার। সেই অধিকার বাস্তবে রূপ দিতে কাজ করছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

প্রতিবছরের মতো এবারও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করেছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভাষা বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানমালা ঋদ্ধ হবে। বিপন্নপ্রায় ভাষাসমূহের সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বজনের ভাষা-সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্যের ধারক-বাহক হবে– এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ আবদুল হামিদ)

**প্রধানমন্ত্রী**
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৯ ফাল্গুন ১৪২৪
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

# বাণী

মহান শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বাংলাসহ বিশ্বের সকল ভাষা ও সংস্কৃতির জনগণকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জীবনে শোক, শক্তি ও গৌরবের প্রতীক। ১৯৫২ সালের এ দিনে ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে প্রাণ দিয়েছিলেন রফিক, শফিক, সালাম, বরকত ও জব্বারসহ আরও অনেকে।

আজকের এই দিনে আমি ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। শ্রদ্ধা জানাই বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সকল ভাষা সৈনিকের প্রতি।

১৯৪৮ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রস্তাবে ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিশ ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১১ মার্চ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সংগ্রাম পরিষদ ধর্মঘট ডাকে। এদিন সচিবালয়ের সামনে থেকে বঙ্গবন্ধুসহ অনেক ছাত্রনেতা গ্রেফতার হন। ১৫ মার্চ তাঁরা মুক্তি পান। ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন জাতির পিতা। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে।

ঐ বছরের ১১ সেপ্টেম্বর ফরিদপুরে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৯ সালের ২১ জানুয়ারি তিনি মুক্তি পান। ১৯ এপ্রিল আবারও তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। জুলাই মাসের শেষে মুক্তি পান। ১৪ অক্টোবর ঢাকায় বঙ্গবন্ধুকে আবার গ্রেফতার করা হয়। কারাগার থেকেই তাঁর দিকনির্দেশনায় আন্দোলন বেগবান হয়। সেই দুর্বার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি শাসকগোষ্ঠীর জারি করা ১৪৪ ধারা ভাঙতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন ভাষা শহিদরা।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারির সেই রক্তস্নাত গৌরবের সুর বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে আজ বিশ্বের ১৯৩টি দেশের মানুষের প্রাণে অনুরণিত হচ্ছে। ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কানাডা প্রবাসী সালাম ও রফিকসহ কয়েকজন বাঙালি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ সরকার জাতিসংঘে প্রস্তাব উত্থাপন করে। যার ফলে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আজ সারাবিশ্বের সকল নাগরিকের সত্য ও ন্যায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রেরণার উৎস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

বিশ্বের ২৫ কোটি মানুষের ভাষা বাংলাকে জাতিসংঘের অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে দাবি উত্থাপন করেছি। বিশ্বের সকল ভাষা সংক্রান্ত গবেষণা এবং ভাষা সংরক্ষণের জন্য আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি।

অমর একুশে আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক। একুশের চেতনা ও মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধকে ধারণ করে আওয়ামী লীগ সরকার দেশের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গত নয় বছরে আমরা দেশের প্রতিটি সেক্টরে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করেছি। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে 'রোল মডেল'। ২০২১ সালের আগেই আমরা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।

আসুন, দল-মত নির্বিশেষে একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে কাজ করি এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখি। সবাই মিলে একটি অসাম্প্রদায়িক, ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি। প্রতিষ্ঠা করি জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ।

আমি সকল ভাষা শহিদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(শেখ হাসিনা)

**মন্ত্রী**
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বাণী

'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগানে মুখরিত ছিল ১৯৫২ সাল। '৫২-এর এই শ্লোগানই ইতিহাসের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ১৯৭১-এ হয়ে উঠেছিল 'জয় বাংলা'। মাতৃভাষার শৃঙ্খল-মুক্তি থেকে মাতৃভূমির শৃঙ্খল-মুক্তির এক অমর মহাকাব্য রচনা করেছি আমরা। আমরা বাঙালি। ভাষা আমাদের কাছে চিরায়ত আবেগ আর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবার অপরিহার্য মাধ্যম। মাতৃভাষার দাবিই আমাদের দিয়েছে মুক্ত, স্বাধীন স্বদেশের স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন উচ্চারিত হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের অবিস্মরণীয় ভাষণে, যে ভাষণকে বিশ্বের প্রামাণ্য ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে *ইউনেস্কো মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার*-এ অন্তর্ভুক্ত করেছে ইউনেস্কো। ভাষার শক্তি দিয়ে যে পরাধীন জাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করা যায় তা বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন জাতির পিতা। তিনিই প্রথম জাতিসংঘে মাতৃভাষা বাংলায় ভাষণ দিয়ে বাংলা মায়ের ভাষাকে পৌঁছে দিয়েছেন বিশ্ব দরবারে।

জাতির পিতার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে এগিয়ে চলেছেন তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনিই *শহীদ দিবস*-কে *আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে* রূপান্তরিত করেছেন। বিশ্বজনের মাতৃভাষা সংরক্ষণে ও বিকাশে তিনি স্থাপন করেছেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। বিশ্বের সকল ভাষা এখানে ঠাঁই পাবে আর সেইসঙ্গে বিশ্বমানবের মনের সকল আবেগ, অনুভূতি এখানে এলে মানুষকে স্পর্শ করবে।

বাংলাসহ বিশ্বের সকল মাতৃভাষার প্রতি সম্মান জানানোই মহান ভাষা শহীদদের প্রতি সম্মান জানানো। আপন মাতৃভাষাকে ভালোবেসেই আমরা ভালোবেসেছি বিশ্বজনের মাতৃভাষা।

মানব সভ্যতার ইতিহাসকে আমরা হারিয়ে যেতে দেব না বলেই সবার ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের দায়িত্ব। আর এ জন্যই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আঙিনায় আমরা সমবেত হয়েছি। আমার ভাইয়ের রক্তের মূল্যে কেনা *একুশে ফেব্রুয়ারি*-কে আমরা *আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস* হিসেবে বিশ্বকে উপহার দিতে জাতিসংঘ-কে অনুপ্রাণিত করেছি। অনাগত দিনে বিশ্বের সকল ভাষাভাষীর পীঠস্থান হয়ে উঠবে এই ইনস্টিটিউট– এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এ লক্ষ্যে সফল হোক সবার সম্মিলিত প্রয়াস, সফল হোক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের বিশ্বভাষার সংরক্ষণ, উন্নয়ন, বিকাশ ও উজ্জীবনের পথে এগিয়ে চলার অগ্রযাত্রা।

পরিশেষে *মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৮* উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গৃহীত অনুষ্ঠানমালার সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

**(নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.)**

**MINISTER**

Ministry of Foreign Affairs
Government of the People's
Republic of Bangladesh

# Message

I am delighted to learn that International Mother Language Institute is going to publish a Souvenir on the occasion of the celebration of the International Mother Language Day 2018.

On this glorious Day, I recall with deep respect the greatest Bengali of all times, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman who inspired the Bengali people to dream of a free motherland and, through his brilliant political activities from 1947 to 1971, brought about the most glorious event in the history of our nation, the Independence of Bangladesh. The historic Language Movement of 1952 was the beginning as well as the turning point of our struggle for self-determination and independence. I recall with deep reverence all language martyrs including Rafiq, Salam, Barkat, Jabbar who sacrificed their lives for the cause of our mother tongue.

Immediately after the independence in 1971, Bangla was declared our state language in 1972. Bangabandhu delivered his maiden speech in Bangla on 25 September 1974 at the 29th session of the General Assembly of the United Nations and thus introduced Bangla afresh to the world.

The spirit of "Amar Ekushey" or "Mother Language Day' spread throughout the world when during the first tenure of Bangabandhu's daughter and Prime Minister Sheikh Hasina, in 1999, the UNESCO declared 21 February as 'The International Mother Language Day'. The Day is now observed all over the world not only for the remembrance of the sacrifice of the language martyrs of Bangladesh but also to inspire citizens of the world to use and protect their mother tongue as well as to respect others' mother tongue.

I am also happy to know that this year UNESCO will observe the International Mother Language Day 2018 with the theme *"Linguistic diversity and multilingualism count for sustainable development"* This has clear reference to the SDG 4.7 and will contribute to ensure a sustainable future for all on earth. We all are aware that many languages are becoming vulnerable and are on the verge of extinction. We should, therefore, try to protect and promote the languages of even smaller linguistic groups to maintain the linguistic diversity.

On this glorious Day, I congratulate all, especially members of different linguistic communities around the world.

Joy Bangla, Joy Bangabandhu.

**(Abul Hassan Mahmood Ali, M.P.)**

**মন্ত্রী**
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বাণী

হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে লালিত ঐশ্বর্যময়ী বাংলাদেশ। কালের পরিক্রমায় নদী-মেখলা বাংলা বারবার শোষিত, লুণ্ঠিত হয়েছে। শত বছরের শোষণ-লুণ্ঠনে জর্জরিত বাঙালি জাতি কালে কালে হয়ে উঠেছে প্রতিবাদমুখর ও বিদ্রোহী। উনিশশ' সাতচল্লিশে দেশবিভক্তির পর তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকচক্রের বিরুদ্ধে এ জাতি আবার সোচ্চার হয়ে উঠল ১৯৫২-তে। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে জাতির অকুতোভয় সন্তানেরা রক্তের অক্ষরে রাজপথে লিখে দিলো ভাষার জয়গান। মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে সেই মহান ভাষা শহীদদের স্মৃতি এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বিশ্বের সকল ভাষা সংরক্ষণ এবং বিকাশে অর্পিত দায়িত্বের পাশাপাশি বিশ্ববাসীর ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের এই মহতী কর্মের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন সারা পৃথিবীর ভাষা-গবেষকবৃন্দ। তাঁদেরই নিরলস শ্রমে সমৃদ্ধ হচ্ছে সকলের মাতৃভাষা, সৃষ্টি হচ্ছে আত্মার মেলবন্ধন, সূচিত হচ্ছে পৃথিবীর টেকসই উন্নয়ন।

ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই আমাদের জাতিসত্তা পর্বতের মতো সুদৃঢ় হয়। সেই পর্বত-কঠিন জাতিসত্তাকে স্বাধীনতার সোনালি বন্দরে পৌঁছে দিলেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর নির্দেশে স্বাধীনতার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণোৎসর্গকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জানাই সশ্রদ্ধ সালাম। ভাষা-সৈনিকেরা শিখিয়ে দিয়ে গেছেন কণ্ঠরোধ করলেই সংগ্রামী হয়ে ওঠে মানুষ, আর মুক্তি-সেনানীরা শিখিয়ে দিয়ে গেছেন সংগ্রাম থেকে আসে স্বাধীনতা।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপনের এ আয়োজনের ডানায় আমরা যোগ করে দিতে চাই ভাষা এবং সংস্কৃতির সোনালি পালক। এ বর্ণাঢ্য আয়োজনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছি আমি, আছি আমরা।

সবার কল্যাণ হোক, সার্থক হোক এ প্রতিষ্ঠানের শুভ উদ্যোগ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(আসাদুজ্জামান নূর, এমপি)

**প্রতিমন্ত্রী**
কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বাণী

আত্মত্যাগের রক্তাক্ত মহিমায় উদ্ভাসিত একুশ আমাদের অহংকার। একুশ আমাদের চেতনাকে শানিত করে, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। বাংলা ভাষা রক্ষার আন্দোলন 'একুশে ফেব্রুয়ারি' আজ বিশ্বে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার প্রতীক-দিবস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। জাতিসংঘ এ দিবসকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠা করেছেন 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট'। এ ইনস্টিটিউট বাংলা ভাষাসহ বাংলাদেশের অন্যান্য সকল ভাষা সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিশ্বের সকল মাতৃভাষার মর্যাদা সমুন্নত রাখা এবং বিপন্নপ্রায় মাতৃভাষাগুলোর অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নয়নে কাজ করছে। কোনো জাতির ভাষার মৃত্যু হলে সে-জাতির সমৃদ্ধ জ্ঞানভান্ডার, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সবই ধ্বংসে হয়ে যায়। শিকড়হীন গাছের মতো সে-জাতির অপমৃত্যু ঘটে। ভাষা কেবল সব ধরনের যোগাযোগের মাধ্যমই নয়, হৃদয়-উৎসারিত সকল আবেগ-অনুভূতির প্রকাশও বটে।

বিশ্বের দুয়েকটি দেশেই কেবল মাতৃভাষার অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় মানুষকে জীবন উৎসর্গ করতে হয়েছে। তবে ভাষার অধিকার রক্ষায় বাঙালি যে পরিমাণ রক্ত দিয়েছে, বোধ করি পৃথিবীর অন্য কোথাও তা হয়নি। তাই মহান ভাষা আন্দোলনে আত্মোৎসর্গকারী ভাষাশহীদ সালাম, রফিক, জব্বার, বরকত, শফিউর-সহ অজ্ঞাত ভাষাশহীদদের নাম গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। সেই সঙ্গে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অকুতোভয় সৈনিক ও স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তৎকালীন গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে বিশ্বে সকল ভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৮ উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আয়োজিত সকল কর্মসূচি সফল ও সুন্দর হোক– এই কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(কাজী কেরামত আলী, এম.পি.)

**Director-General**

UNESCO

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

# Message

## On the Occasion of International Mother Language Day

21 February 2018

Today, UNESCO marks the nineteenth International Mother Language Day. This is an opportunity to recall our Organization's commitment to defending and promoting languages.

A language is far more than a means of communication; it is the very condition of our humanity. Our values, our beliefs and our identity are embedded within it. It is through language that we transmit our experiences, our traditions and our knowledge. The diversity of languages reflects the incontestable wealth of our imaginations and ways of life.

In order to preserve and vitalize this essential component of the intangible heritage of humanity, UNESCO has been actively engaged for many years in the defence of linguistic diversity and the promotion of multilingual education.

This commitment concerns mother languages in particular, which shape millions of developing young minds, and are the indispensable vector for inclusion in the human community, first at the local level, then at the global level.

UNESCO thus supports language policies, particularly in multilingual countries, which promote mother languages and indigenous languages. It recommends the use of these languages from the first years of schooling, because children learn best in their mother language. It also encourages their use in public spaces and especially on the Internet, where multilingualism should become the rule. Everyone, regardless of their first language, should be able to access resources in cyber space and build online communities of exchange and dialogue. Today, this is one of the major challenges of sustainable development, at the heart of the United Nations 2030 Agenda.

Every two weeks, one of the world's languages disappears, and with it goes part of our human history and cultural heritage. Promoting multilingualism also helps to stop this programmed extinction.

In the wonderful words of Nelson Mandela, "If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart". On the occasion of this international day, UNESCO invites its Member States to celebrate, through a variety of educational and cultural initiatives, the linguistic diversity and multilingualism that make up the living wealth of our world.

**Ms Audrey Azoulay**

**সচিব**
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও বাংলাদেশ প্রতিনিধি, ইউনেস্কো কার্যনির্বাহী বোর্ড

# বাণী

উনিশশ' বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষার জন্য বাঙালি তরুণেরা আত্মোৎসর্গ করেছিল। সেই অতুলনীয় আত্মত্যাগের ফলে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি অর্জিত হয়। আত্মবিসর্জনের এ মহান চেতনাকে বিশ্বের সকল ভাষাভাষীর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে জাতিসংঘ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণা করে। এই ঘোষণায় অনুপ্রাণিত হয়ে হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। বিশ্বের সমস্ত ভাষার সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও গবেষণার লক্ষ্যে ঢাকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০১ সালের ১৫ই মার্চ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ-ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্বের সকল জাতিগোষ্ঠীর মাতৃভাষা লালন ও সংরক্ষণের প্রয়াস আমাদের বড় অর্জন। জাতিসংঘে প্রথম বাংলায় ভাষণ দিয়ে বঙ্গবন্ধু এ-ভাষাকে বিশ্বদরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক বাংলা ভাষণ *বিশ্বের প্রামাণ্য ঐতিহ্য*-এর অংশ হিসেবে ইউনেস্কো কর্তৃক ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার-এ ঠাঁই পেয়েছে। আর তাঁরই সুযোগ্য কন্যার মানসজাত ফসল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বিশ্বের সকল ভাষা সংরক্ষণ ও উন্নয়নে কাজ করছে।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর ভাষা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের পাশাপাশি বিশ্বের অন্যান্য দেশের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন ভাষাগুলোর অস্তিত্ব রক্ষায় ও উন্নয়নে এ-ইনস্টিটিউট তার কার্যক্রমের প্রাথমিক ধাপ অতিক্রম করছে। বিশ্বের সকল নৃগোষ্ঠীর ব্যবহৃত ও বিপন্নপ্রায় ভাষা, তাদের ভাষিক ও জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় ভাষাভাষীরা নতুনভাবে পাচ্ছে অনুপ্রেরণা, শক্তি ও সাহস। বিশ্বমানবের মধ্যে অন্তঃশীলা ফল্গুধারার মতো ছড়িয়ে পড়ছে ভাষাবৈচিত্র্য রক্ষার তাগিদ।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে। ১২-তলাবিশিষ্ট এ-ইনস্টিটিউট ভবনের ইতোমধ্যে ৬-তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। দ্বিতীয়পর্যায়ের প্রকল্প কাজের মধ্যে রয়েছে অত্যাধুনিক ভাষা-জাদুঘর স্থাপন, লিখনবিধির আর্কাইভ স্থাপন ও লাইব্রেরি অটোমেশন ইত্যাদি। ইনস্টিটিউটটি ইতোমধ্যে ইউনেস্কো ক্যাটিগরি ২ প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি লাভ করেছে। ফলে এর মর্যাদা ও কর্মপরিধি অনেক বেড়ে গিয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ও সময়োপযোগী দিক-নির্দেশনায় আমাদের সামগ্রিক চলার পথ আরও মসৃণ এবং গতি বেগবান হবে– সেটাই সকলের প্রত্যাশা। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউট কর্তৃক গৃহীত সকল আয়োজন সুন্দর ও সফল হোক।

সোহরাব

(মোঃ সোহরাব হোসাইন)

**সচিব**
কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বাণী

মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনে অকুতোভয় বাঙালি বীরসন্তানদের রক্তস্নাত আত্মদানের তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী। মহান একুশে আমাদের দিয়েছে জাতিগত ঐক্য ও সংঘবদ্ধ আন্দোলনের অবিনশী চেতনা– যা পরবর্তীকালের সকল আন্দোলন-সংগ্রামের আলোকবর্তিকারূপে কাজ করেছে। এর ধারাবাহিকতায় ভাষা আন্দোলনের প্রধান নেপথ্য শক্তি এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদী নেতৃত্বে বাঙালিজাতি অর্জন করেছে তার কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা– বিশ্বমানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটেছে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের।

জাতিসংঘের অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণা করে। এই অনন্য স্বীকৃতির প্রেক্ষাপট নির্মাণে এবং চূড়ান্ত সফলতা অর্জনে তৎকালীন ও বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনার নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের বিকাশমান ও বিলুপ্ত-প্রায় ভাষাগুলির সংরক্ষণ, মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা এবং ভাষাবিষয়ক গবেষণার জন্য ঢাকায় স্থাপন করেন 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট'। এ ইনস্টিটিউট বর্তমানে ইউনেস্কো *ক্যাটিগরি-২* প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ইউনেস্কো এ-বছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে: *Linguistic diversity and multilingualism count for sustainable development.* জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বহুভাষিকতা ও ভাষিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকারই এ প্রতিপাদ্যের অন্যতম লক্ষ্য। বর্তমান সরকার মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসারে বদ্ধপরিকর। উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষাকেও গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে নভেম্বর ২০১৬ থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ' নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ কার্যক্রম শুরু করে। শিক্ষার আধুনিকায়ন এবং জাতীয় উন্নয়নে এ বিভাগ নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখছে।

আমি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ আলমগীর)

**মহাপরিচালক**
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

# বাণী

জীবজগতে কেবল মানুষের ভাষা আছে। ভাষা ব্যবহারের জন্য যে বিশেষ জৈবিক সংগঠন প্রয়োজন– মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণির তা নেই। সভ্যতা মানুষের সৃষ্টি আর এ সভ্যতার প্রথম স্পন্দন হলো ভাষা। আমরা মায়ের কাছ থেকে প্রথম ভাষা অর্জন করি, পরে তা শিখি পরিবেশ থেকে। মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা মাতৃভাষাকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে ভাষা-সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি। এ পরিচয় জাতিক সম্প্রদায়কে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে, নিজস্ব সত্তা-স্বরূপে চিহ্নিত করে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এক ভাষাভাষী মানুষ অন্য ভাষাভাষীকে হত্যা করেছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কর্তৃক সেই গণহত্যা ও ভাষা-হত্যার ফলে বিলুপ্ত হয়েছে বহু ভাষিক জনগোষ্ঠী ও তাদের মাতৃভাষা। এ দেশের ইতিহাসেও সেই অপশক্তি নখ-দন্ত বিস্তার করতে চেয়েছিল। সাতচল্লিশ-উত্তরকালে পাকিস্তানি শাসকচক্র আমাদের ভাষা, জাতিগত স্বকীয়তা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে নিশ্চিহ্ন করতে অপচেষ্টায় তৎপর হয়েছিল। কিন্তু সে দুরভিসন্ধি সফল হয়নি। এ জাতি বুঝেছিল যে, আমাদের জাতিগত স্বকীয়তা, হাজার বছর ধরে লালিত সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে নিজ দেশে পরবাসী হয়ে বেঁচে থাকা নিরর্থক। ফলে জাতি সংঘবদ্ধ শক্তিতে জাগরিত হয়ে আগ্রাসী শক্তিকে পরাভূত করতে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়। বাংলার তরুণ সমাজই প্রথম প্রতিবাদ করে। ক্রমান্বয়ে সেই চেতনা ও প্রতিজ্ঞা সর্বত্র প্রসারিত, সুতীব্র ও সুসংহত হয়। বিজয় ছিনিয়ে আনে বাঙালি। বুকের রক্ত দিয়েই এ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা মায়ের ভাষার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের সংগঠক ও চালিকাশক্তি ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পরবর্তীকালের সকল সংগ্রাম ও আন্দোলন তাঁরই নির্দেশে পরিচালিত হয়েছে। তিনি স্বাধীনতার স্থপতি, বাঙালি জাতিসত্তার রূপকার। মহান ভাষা-আন্দোলনের এই দিনে আমি সকল ভাষাশহীদ এবং হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

একুশ আমাদের প্রেরণা ও শক্তি। আমরা চাই একুশের মাহাত্ম্য ও চেতনা বিশ্বে প্রসারিত হয়ে সকল মাতৃভাষাভাষীকে উজ্জীবিত করুক। আমাদের সেই প্রত্যাশাকে বাস্তবনিষ্ঠ রূপ দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনা। বাঙালির ২১শে ফেব্রুয়ারিকে তিনি *আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস*-এ রূপান্তরিত করেছেন। এ প্রতিষ্ঠান এখন ইউনেস্কো ক্যাটিগরি-২ কেন্দ্র। বিশ্বের মাতৃভাষার গবেষণা, বিশেষত মাতৃভাষাশ্রয়ী বহুভাষিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের কার্যক্রম সম্পাদনই এর লক্ষ্য। ইনস্টিটিউট সেই প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নে ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধ ও প্রসারিত হচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি, অদূর ভবিষ্যতে এ প্রতিষ্ঠান বিশ্বে মাতৃভাষা গবেষণার অন্যতম অধিকেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভে সক্ষম হবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী)

**Head and Representative**

UNESCO Dhaka Office

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

# Message

With the strong initiative of Bangladesh, International Mother Language Day was proclaimed by UNESCO in 1999, and since almost 20 years 21 February is being celebrated by UNESCO, our member states and worldwide as annual observance to promote awareness of linguistic and cultural diversity and mother tongue-based multilingual education.

To strengthen the message, each year a different theme is the area of focus. In 2018, the theme of International Mother Language Day is **"Linguistic diversity and multilingualism count for sustainable development"**.

UNESCO highly appreciates the efforts and commitment of the Government of Bangladesh in the cause of international mother language, multilingual education and linguistic diversity tangibly expressed with the establishment of the International Mother Language Institute (IMLI) in Dhaka, which is a category 2 institute under the auspices of UNESCO since November 2015. IMLI is committed to further the development and strengthening of education systems by paying special attention to the promotion of mother language education and learning, and in conducting research for the documentation and development of mother languages of the world to promote multilingual education.

UNESCO greatly appreciates the commitment of IMLI to observe International Mother Language Day with a variety of events that engage and raise awareness about promoting linguistic diversity and mother languages. In 2018 the observance spans over four days of inter-connected events, including an opening ceremony, an international seminar on "Language Documentation and Revitalization", a national seminar on "Multilingual Education and National Development", and a children's art competition.

UNESCO wishes to congratulate the Government of Bangladesh and IMLI in their efforts, not only for the 21 February, but throughout the year, in furthering the linguistic diversity and multilingualism that make up the living wealth of our world. UNESCO Dhaka Office is committed to support you in this journey.

Beatrice Kaldun

**(Beatrice Kaldun)**

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Sustainable Development Goals

# International Mother Language Day

## Acting together for Linguistic diversity and Multilingualism

**21 February 2018**

Education 2030

# সূচি


| | |
|---|---|
| বাণী | ৭-২৭ |
| বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ভাষণ | ৩৫ |
| স্মৃতির দখিন দুয়ার<br>শেখ হাসিনা | ৩৯ |
| ছোটো 'পা তোর নকশি কাঁথা<br>মোহাম্মদ সাদিক | ৪৮ |
| অসাম্প্রদায়িক বাংলাভাষা : দেশীয় ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি<br>মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন | ৪৯ |
| আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্মবাণী<br>যতীন সরকার | ৫৩ |
| একুশে ফেব্রুয়ারি<br>কামাল চৌধুরী | ৫৮ |
| মাতৃভাষা নিয়ে লড়াই<br>সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম | ৫৯ |
| মুজিবের নামে শপথ<br>কাবেদুল ইসলাম | ৬২ |
| প্রিয়তম বাংলা ভাষা চিরজীবী হোক<br>মোনায়েম সরকার | ৬৩ |
| একুশের আলোকে প্রবাদ-বচন আর বাঙালি রীতি<br>মোহাম্মদ জমির | ৬৭ |
| শুধু একটি 'অথবা'<br>রশীদ হায়দার | ৭১ |
| মহান একুশে ফেব্রুয়ারির সামাজিক গুরুত্ব<br>খ. ম. রেজাউল করিম | ৭৭ |

**Multilingualism and National Development** ৮৯
J. B. Disanayaka

**Substantivist Linguistics in the Context of Language Rights** ৯৯
Probal Dasgupta

**Mother tongue – Root of all Culture** ১১১
Dr. K. Sreenivasarao

**Mother Language Based Education: Digitisation of what and for whom** ১১৩
Dr. DP Pattanayak

**আলোকচিত্র আর্কাইভ থেকে** ১১৭

# সংকলিত
# ভাষণ
# ও
# রচনা

# বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

## -এর ভাষণ

### বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে আত্মনিয়োগ করুন*

শিল্পী, সাহিত্যিক এবং কবিদের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই প্রতিফলিত করতে হবে। তাঁরা তাঁদের মানুষ, তাঁদের মাতৃভূমি ও সংস্কৃতির জন্যে শিল্পচার্য [শিল্পচর্চা] করবেন।

*দেশের সাধারণ মানুষ, যারা আজও দুঃখী, যারা আজও নিরন্তর সংগ্রাম করে বেঁচে আছে, তাদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখকে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির উপজীব্য করার জন্যে শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।*

জনগণের স্বার্থে এবং বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্যে সাহিত্যিকদের প্রাণ খুলে আত্মনিয়োগ করার জন্যে আমি আবেদন জানাচ্ছি। আমি তাঁদের আশ্বাস দিচ্ছি, শিল্পী, কবি ও সাহিত্যিকবৃন্দের সৃষ্টিশীল বিকাশের যে কোনো অন্তরায় আমি এবং আমার দল প্রতিহত করবে।

আজ আমাদের সংস্কৃতির সামনে কোনো চক্রান্ত নেই, শাসন বা নিয়ন্ত্রণের বেড়াজাল নেই। শিল্পী-সাহিত্যিকরা আর মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী ব্যক্তিবর্গের জন্যে সংস্কৃতিচর্চা করবেন না। দেশের সাধারণ মানুষ, যারা আজও দুঃখী, যারা আজও নিরন্তর সংগ্রাম করে বেঁচে আছে, তাদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখকে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির উপজীব্য করার জন্যে শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

রাজনৈতিক ক্ষমতা না পেলে সংস্কৃতিকে গড়ে তোলা যায় না। বাংলাদেশের মানুষের রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না বলেই বাংলা সংস্কৃতির বিকাশ হয় নি।

স্বাধীনতার পর বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্যে প্রায় কিছুই করা হয় নি। শিল্পী, সাহিত্যিক এবং সংস্কৃতিসেবীদের তাঁদের সৃষ্টিশীল কাজের মাধ্যমে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত করতে দেয়া হয় নি। যে সংস্কৃতির সাথে দেশের মাটি ও মনের সম্পর্ক নেই তা বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না।

ধর্ম ও জাতীয় সংসহির [সংহতির] নামে আমাদের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এই চক্রান্ত আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আমাদের জনগণ এই চক্রান্ত প্রতিহত করেছে। আপনারা সবাই আমাদের মহান ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস জানেন।...

**ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশানস্-এর সাংস্কৃতিক ও চলচ্চিত্র বিষয়ক সাপ্তাহিক 'পূর্বাণী'র ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭০ ঢাকার হোটেল পূর্বাণীতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রেডিও-টিভিতে রবীন্দ্র সঙ্গীত বন্ধ করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পূর্বাণী উচ্চকণ্ঠ সমালোচক ছিল। আইয়ুব আমলে পূর্বাণীর প্রকাশনা দীর্ঘদিন সরকারি নির্দেশে বন্ধ রাখা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে ভাষা, সংস্কৃতি ও মানুষের প্রতি শিল্পী-সাহিত্যিকদের দায়িত্বের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তাঁর ভাষণের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলো।*

*সূত্র: দৈনিক আজাদ, দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক সংগ্রাম, ১ জানুয়ারি ১৯৭১; সংগৃহীত, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, আনু মাহমুদ সম্পাদিত, ন্যাশনাল পাবলিকেশন, ঢাকা, সংশোধিত সংস্করণ ২০১৫, পৃষ্ঠা ৮৫-৮৫*

## বাংলা ও বাঙালির প্রকৃত ইতিহাস রচনা করুন**

বাংলার মানুষ বিশেষ করে ছাত্র এবং তরুণ সম্প্রদায়কে আমাদের ইতিহাস এবং অতীত জানতে হবে। বাংলার যে ছেলে তার অতীত বংশধরদের ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারে না, সে ছেলে সত্যিকারের বাঙালি হতে পারে না। আজো বাংলাদেশের গৌরবময় ইতিহাস রচিত হয় নি। নতুন করে বাঙালির ইতিহাস রচনা করার জন্যে দেশের শিক্ষাবিদদের প্রতি আমি আহ্বান জানাচ্ছি। এই ইতিহাস পাঠ করে যেন বাংলার ভবিষ্যৎ বংশধররা তাদের গৌরবময় অতীতের পরিচয় পেয়ে গর্ব অনুভব করতে পারে এবং মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে।

অতীতে বাংলাদেশের গৌরবময় ইতিহাসকে বিকৃত করার সুপরিকল্পিত চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমার মুখের ভাষাকে কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, আরবি হরফে বাংলা লেখার চেষ্টা করা হয়েছে, হরফ-সংস্কার, ভাষা-সংস্কার, বানান-সংস্কারের চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা আন্দোলন করে তা রুখেছি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুলকে বাদ দিয়ে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের কথা ভাবা যায় না। কিন্তু এর উপর বারবার হামলা এসেছে। ভেবে অবাক হতে হয়, কাজী নজরুলের কবিতার শব্দ পরিবর্তন করা হয়েছে। গানের শব্দ বদল করে রেডিওতে গাওয়া হয়েছে। তারা মুসলমানী করিয়েছেন। এ অধিকার তাদের কে দিল?

নির্বাচনের ফলাফলই বলে দিচ্ছে বাঙালি, বাঙালি হিসেবেই বেঁচে থাকবে, কেউ তা রুখতে

পারবে না। এবারকার নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ তাদের রায়ের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছে যে, বাংলাদেশের সম্পদ এবং বাঙালির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার আর কোনো মতেই দাবিয়ে রাখা যাবে না। বিগত ২৩ বছর ধরে একটানা শোষণ ও অবিচারের ফলে বাঙালিরা আজ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়েছে। আওয়ামী লীগ এই অন্যায় ও অবিচার মেনে নিতে পারে না। জনগণের স্বাধীনতার ফলভোগকে নিশ্চিত করার জন্যে আওয়ামী লীগ শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবে।...

*আজো বাংলাদেশের গৌরবময় ইতিহাস রচিত হয় নি। নতুন করে বাঙালির ইতিহাস রচনা করার জন্যে দেশের শিক্ষাবিদদের প্রতি আমি আহ্বান জানাচ্ছি। এই ইতিহাস পাঠ করে যেন বাংলার ভবিষ্যৎ বংশধররা তাদের গৌরবময় অতীতের পরিচয় পেয়ে গর্ব অনুভব করতে পারে এবং মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে।*

আজো বাংলাদেশের ইতিহাস রচিত হয় নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাঙালির গৌরবময় ভূমিকাকে চাপা দেয়ার অপচেষ্টা করা হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতিকে পর্যন্ত উপক্ষো প্রদর্শন করা হয়েছে। স্বাধীনতার জন্যে বাংলার হাজার হাজার ছেলে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হয়েছে, বাংলার বহু সন্তান ফাঁসির মঞ্চে ঝুলেছে, চট্টগ্রামের পাহাড়ে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছে। সিপাহী বিদ্রোহ ব্যারাকপুর থেকে শুরু হয়েছিল। সেদিন বাঙালিদের কেউই বেঈমানী করে নি। বড় নেতাদের দেশের লোকেরাই বেইমানী করেছিল। তিতুমীর বাঁশের কেল্লা বানিয়ে সংগ্রাম করে শহীদ হয়েছেন। কিন্তু পাকিস্তানের ইতিহাসে তাঁর উল্লেখ নেই। তাঁদের বীরত্ব ও ত্যাগ-তিতিক্ষার গাথা-ভিত্তিক ইতিহাস রচনার জন্যে শিক্ষাবিদদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।...

***আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ১৯৭১ সনে সংগঠনের ২৩ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করে। এ উপলক্ষে ৪ জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখে ঢাকার রমনা গ্রিনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বাংলা ও বাঙালির প্রকৃত ইতিহাস রচনার জন্যে লেখকদের প্রতি আহ্বান জানান যাতে করে পাকিস্তানী শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রণীত বাঙালির বিকৃত ইতিহাস বর্জন করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'পাকিস্তান: দেশ ও কৃষ্টি' নামক এ ধরনের একটি বই ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে ১৯৭০ স্কুলের পাঠ্যসূচি থেকে প্রত্যাহার করা হয়। তাঁর ভাষণের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলো।*

*সূত্র : দৈনিক আজাদ, দৈনিক পাকিস্তান, দৈনিক পূর্বদেশ, দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ জানুয়ারি, ১৯৭১: সংগৃহীত, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, আবু মাহমুদ সম্পাদিত, ন্যাশনাল পাবলিকেশন, ঢাকা, সংশোধিত সংস্করণ ২০১৫, পৃষ্ঠা ৯১-৯২*

# স্মৃতির দখিন দুয়ার

শেখ হাসিনা*

গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া গ্রামখানি একসময় মধুমতী নদীর তীরে ছিল। বর্তমানে মধুমতী বেশ দূরে সরে গেছে। তারই শাখা হিসেবে পরিচিত বাইগার নদী এখন টুঙ্গীপাড়া গ্রামের পাশ দিয়ে কুল কুল ছন্দে ঢেউ তুলে বয়ে চলেছে। রোদ ছড়ালে বা জ্যোৎস্না ঝরলে সে নদীর পানি রুপোর মতো ঝিকমিক করে।

*আমার বাবা যখনই সময় ও সুযোগ পেতেন একবার বাড়ি এলে আমরা কিছুতেই তাঁকে ছেড়ে দিতাম না। বাবার কোলে বসে গল্প শোনা, তাঁর সঙ্গে খাওয়া, আমার শৈশবে যতটুকু পেয়েছি তা মনে হতো অনেকখানি।*

নদীর পাড় ঘেঁষে কাশবন, ধান-পাট-আখ ক্ষেত, সারিসারি খেজুর, তাল-নারকেল-আমলকি গাছ, বাঁশ-কলাগাছের ঝাড়, বুনো লতা-পাতার জংলা, সবুজ ঘন ঘাসের চিকন লম্বা লম্বা সতেজ ডগা। শালিক-চড়ুই পাখিদের কল-কাকলি, ক্লান্ত দুপুরে ঘুঘুর ডাক। সব মিলিয়ে ভীষণ রকম ভালো-লাগার এক টুকরো ছবি যেন। আশ্বিনের এক সোনালি রোদ্দুর ছড়ানো দুপুরে এ টুঙ্গীপাড়া গ্রামে আমার জন্ম। গ্রামের ছায়ায় ঘেরা, মায়ায় ভরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ এবং সরল-সাধারণ জীবনের মাধুর্যের মধ্য দিয়ে আমি বড় হয়ে উঠি।

আমাদের বসতি প্রায় দু'শ বছরের বেশি হবে। সিপাহি বিপ্লবের আগে তৈরি করা দালান-কোঠা এখনও রয়েছে। আমাদের আত্মীয়-স্বজনরা সেখানে বসবাস করেন। তবে বেশির ভাগ ভেঙে পড়েছে, সেখানে এখন সাপের আখড়া। নীলকর সাহেবদের সঙ্গে আমাদের পূর্বপুরুষদের অনেক গোলমাল হতো। মামলা-মোকদ্দমা হয়েছে। ইংরেজ সাহেবদের সঙ্গেও গণ্ডগোল লেগেই থাকত।

একবার এক মামলায় এক ইংরেজ সাহেবকে হারিয়ে জরিমানা পর্যন্ত করা হয়েছিল। ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে সে ভাঙা দালান এখনও বিধ্বস্ত অবস্থায় রয়েছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক সেনাবাহিনী ঐ দালানের ওপর হামলা চালিয়েছিল। আমার দাদা-দাদিকে সামনের রাস্তায় বসিয়ে রেখে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল।

*মননশীল প্রবন্ধ লেখক ও রাজনীতিক। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী

আমাদের গ্রামে ঢাকা থেকে স্টিমারে যেতে সময় লাগত সতেরো ঘণ্টা। রাস্তা-ঘাট ছিলই না। নৌকা ও পায়ে হাঁটা পথ একমাত্র ভরসা ছিল। তারপরও সে গ্রাম আমার কাছে বিরাট আকর্ষণীয় ছিল। এখন অবশ্য গাড়িতে যাওয়া যায়। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্পিডবোটেও যাওয়া যায়। গোপালগঞ্জ থেকে টুঙ্গীপাড়া নৌকায় যেতে তিন-চার ঘণ্টা সময় লাগে।

আমার শৈশবের স্বপ্ন-রঙিন দিনগুলো কেটেছে গ্রাম-বাংলার নরম পলিমাটিতে, বর্ষার কাদা-পানিতে, শীতের মিষ্টি রোদ্দুরে, ঘাসফুল আর পাতায় পাতায় শিশিরের ঘ্রাণ নিয়ে, জোনাক-জ্বলা অন্ধকারের ঝিঁঝিঁর ডাক শুনে, তাল-তমালের ঝোপে বৈঁচি, দীঘির শাপলা আর শিউলি-বকুল কুড়িয়ে মালা গেঁথে, ধুলোমাটি মেখে, বর্ষায় ভিজে খেলা করে।

*ঘাতকের দল বাংলার প্রাণকেন্দ্র ঢাকা থেকে সরিয়ে সে মহাপুরুষকে নিভৃতে পল্লীর মাটিতেই কবর দিয়েছে। ইতিহাসের পাতা থেকে তাঁকে মুছে ফেলার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছে– কিন্তু পেরেছে কি?*

আমার বাবা শেখ মুজিবুর রহমান রাজনীতি করতেন। বেশির ভাগ সময় তাঁকে তখন জেলে আটকে রাখা হতো। আমি ও আমার ছোট ভাই কামাল মায়ের সঙ্গে গ্রামের বাড়িতে দাদা-দাদির কাছে থাকতাম। আমার জন্মের সময় বাবা কলকাতায় পড়তেন, রাজনীতি করতেন। খবর পেয়েও দেখতে আসেন বেশ পরে।

আমার বাবা যখনই সময় ও সুযোগ পেতেন একবার বাড়ি এলে আমরা কিছুতেই তাঁকে ছেড়ে নড়তাম না। বাবার কোলে বসে গল্প শোনা, তাঁর সঙ্গে খাওয়া, আমার শৈশবে যতটুকু পেয়েছি তা মনে হতো অনেকখানি।

বাবাকে একবার গোপালগঞ্জ থানায় আনা হলে দাদার সঙ্গে আমি ও কামাল দেখতে যাই। কামালের তো জন্মই হয়েছে বাবা যখন ঢাকায় জেলে। ও বাবাকে খুব কাছ থেকে তখনও দেখেনি। আমার কাছেই বাবার গল্প শুনত মুগ্ধ হয়ে। গোপালগঞ্জ জেলখানার কাছে পুকুর পাড়ে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, বাবাকে নিয়ে যাবে কোর্টে তখনই আমরা দেখব। কামাল কাছ ঘেঁষে বলল: হাচুপা, তোমার আব্বাকে 'আব্বা' বলতে দেবে। আমার শৈশবের হৃদয়ের গভীরে কামালের এ অনুভূতিটুকু আজও অম্লান হয়ে আছে। বাবাকে আমাদের শৈশবে-কৈশোরে খুব কমই কাছে পেয়েছি। শৈশবে পিতৃস্নেহ বঞ্চিত ছিলাম বলে দাদা-দাদি, আত্মীয়-স্বজন, গ্রামের মানুষের অশেষ স্নেহ-মমতা পেয়েছি।

আমাদের পরিবারের জন্য মৌলভি, পণ্ডিত ও মাস্টার বাড়িতেই থাকতেন। আমরা বাড়ির সব ছেলেমেয়ে সকাল-সন্ধ্যা তাঁদের কাছে লেখাপড়া শিখতাম। গ্রামের প্রাইমারি স্কুলেও কিছুদিন পড়াশোনা করেছিলাম। আমার কৈশোরকাল থেকে শহরে বাস করলেও গ্রামের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ ছিল। ১৯৫২ সালে আমার দাদার সঙ্গে আমাদের বাড়ির নিজস্ব

নৌকায় চড়ে প্রথম ঢাকা শহরে আসি। আমার স্নেহময়ী দাদা-দাদি ও আত্মীয়-স্বজন বেশির ভাগ গ্রামে বাস করতেন। স্কুলে ছুটি হলে বা অন্যান্য উৎসবে বছরে প্রায় তিন-চারবার গ্রামে চলে যেতাম। আজও আমার গ্রামের প্রকৃতি, শৈশব আমাকে ভীষণভাবে পিছু টানে।

আমার শৈশবের দিনগুলো ভীষণ রকম স্মৃতিময়। আজ সেসব দিনের কথা যেন স্মৃতির দখিন দুয়ার খোলা পেয়ে বারবার ভেসে আসছে। একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। আমার বাবার এক চাচাতো বোন, আমার চেয়ে বয়সে তিন-চার বছর বড় হবে। সে ফুফুর সঙ্গে বাড়ির সব ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছি। খালের ওপর ছিল বাঁশের সাঁকো। সে সাঁকোর ওপর দিয়ে যেতে হবে। প্রথম দিন কী দারুণ ভয় পেয়েছিলাম! আমার হাত-পা কাঁপছিল। ফুফুই আমাকে সাহস দিয়ে হাত ধরে সাঁকো পার করিয়ে দিয়েছিল। এরপর আর কখনো ভয় করেনি। বরং সবার আগে আমিই থাকতাম।

*দেশ ও জনগণের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করতে পেরে আমি গর্বিত। আমার জীবনের শেষ দিনগুলো আমি টুঙ্গীপাড়ায় স্থায়ীভাবে কাটাতে চাই। খুব ইচ্ছে আছে নদীর ধারে একটি ঘর তৈরি করার। আমার বাবা-মার কথা স্মৃতিকথামূলকভাবে লেখার ইচ্ছে আছে।*

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নদীর ধারে বেড়ানো, শীতের দিনে নদীর উষ্ণ পানিতে পা ভেজানো আমার কাছে ভীষণ রকম লোভনীয় ছিল। নদীর পানিতে জোড়া নারকেল ভাসিয়ে অথবা কলাগাছ ফেলে সাঁতার কাটা, গামছা বিছিয়ে টেংরা-পুঁটি-খল্লা মাছ ধরা। বর্ষাকালে খালে অনেক কচুরিপানা ভেসে আসত। সে কচুরিপানা টেনে তুললে তার শেকড় থেকে বেরিয়ে আসত কই ও বাইন মাছ। একবার একটি সাপ দেখে খুব ভয় পেয়েছিলাম।

বৈশাখে কাঁচা আম পেড়ে কুচি কুচি করে কেটে সর্ষেবাটা ও কাঁচা মরিচ মাখিয়ে, তারপর কলাপাতা কোনাকুনি করে সে আম মাখা পুরে, তার রস টেনে খাওয়ার মজা ও স্বাদ আমাকে এখনও আপ্লুত করে রাখে। কলাপাতায় এ আম মাখা পুরে যে না খেয়েছে, কিছুতেই এর স্বাদ বুঝবে না। আর কলাপাতায় এ আম মাখা পুরলে তার ঘ্রাণই হতো অন্য রকম। এভাবে আম খাওয়া নিয়ে কত মারামারি করেছি। ডাল ঝাঁকিয়ে বরই পেড়ে কাড়াকাড়ি করে খেতাম। গ্রামের বড় তালাবের (পুকুর) পাড়ে ছিল বিরাট এক বরই গাছ। ঝাঁকুনির ফলে লালের আভা লাগা সব থেকে টলটলে বরইটি পুকুরের গভীর পানিতে গিয়ে পড়ত এবং কারও পক্ষে কিছুতেই সেটি যখন তুলে আনা সম্ভব হতো না তখন সে বরইটির জন্য মন জুড়ে থাকা দুঃখটুকু এখনও ভুলতে পারলাম কই?

পাটক্ষেতের ভেতর দিয়ে আমরা ছোট্ট ডিঙ্গি নৌকা চড়ে ঘুরে বেড়াতাম। আমার দাদার

একটি বড় নৌকা ছিল, যার ভেতরে দুটো ঘর ছিল, জানালাও ছিল বড় বড়। নৌকার পেছনে হাল, সামনে দুই দাঁড় ছিল। নৌকার জানালায় বসে নীল আকাশ আর দূরের ঘন সবুজ গাছপালা-ঘেরা গ্রাম দেখতে আমার বড় ভালো লাগত। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় সে নৌকা ভেঙে নষ্ট হয়ে যায়। শৈশবের ফেলে আসা সে গ্রাম আমার কাছে এখনও যেন সুভাষিত ছবির মতো।

আমার বাবার জন্মস্থানও টুঙ্গীপাড়ায়। তিনি এখন ঐ গ্রামের মাটিতেই ছায়াশীতল পরিবেশে ঘুমিয়ে আছেন। তাঁর পাশেই আমার দাদা-দাদির কবর। যাঁরা আমার জীবনকে অফুরন্ত স্নেহমমতা দিয়ে ভরিয়ে তুলেছিলেন, আজ আমার গ্রামের মাটিতেই তাঁরা মিশে আছেন। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট ঘাতকের নির্মম বুলেটে আমার মা, বাবা, ভাই ও আত্মীয়-পরিজন অনেককে হারাই। দেশ ও জাতি হারায় তাদের বেঁচে থাকার সকল সম্ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বাধীন সত্তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ঘাতকের দল বাংলার প্রাণকেন্দ্র ঢাকা থেকে সরিয়ে সে মহাপুরুষকে নিভৃতে পল্লীর মাটিতেই কবর দিয়েছে। ইতিহাসের পাতা থেকে তাঁকে মুছে ফেলার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছে– কিন্তু পেরেছে কি?

*গ্রামই আমাদের জীবন। আলোকোজ্জ্বল আধুনিক রাজধানী ও শহরকে বাঁচিয়ে রাখছে গ্রামীণ অর্থনীতি আর মানুষ। ছোট-বড় সব গ্রামকেই আমাদের ঐতিহ্য-অনুসারী আধুনিক ও আদর্শ গ্রাম হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।*

বাবার কাছাকাছি বেশি সময় কাটাতাম। তাঁর জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক আলোচনা করার সুযোগও পেতাম। তাঁর একটি কথা আজ খুব বেশি করে মনে পড়ে। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'শেষ জীবনে আমি গ্রামে থাকব। তুই আমাকে দেখবি। আমি তোর কাছেই থাকব।' কথাগুলো আমার কানে এখনও বাজে। গ্রামের নিঝুম পরিবেশে বাবার মাজারের এ পিছুটান আমি পৃথিবীর যেখানেই থাকি না কেন, আমাকে বারবার আমার গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

আমি এখন নিজেকে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছি। দেশ ও জনগণের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করতে পেরে আমি গর্বিত। আমার জীবনের শেষ দিনগুলো আমি টুঙ্গীপাড়ায় স্থায়ীভাবে কাটাতে চাই। খুব ইচ্ছে আছে নদীর ধারে একটি ঘর তৈরি করার। আমার বাবা-মার কথা স্মৃতিকথামূলকভাবে লেখার ইচ্ছে আছে। আমার বাবা রাজনীতিবিদ মুজিবকে সবাই জানতেন। কিন্তু ব্যক্তি মুজিব যে কতো বিরাট হৃদয়ের ছিলেন, সেসব কথা আমি লিখতে চাই।

গ্রামকে তো আমি আমার শৈশবের গ্রামের মতো করেই ফিরে পেতে চাই। কিন্তু চাইলেই তো আর হবে না। এখন সময় দ্রুত বদলাচ্ছে। যান্ত্রিকতার স্পর্শে গ্রামের সরল সাধারণ জীবনেও ব্যস্ততা বেড়েছে, চমক জেগেছে। মানুষও ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। এ শতাব্দীতে

বাস করে বিজ্ঞানের আশীর্বাদকে অস্বীকার করার উপায় নেই। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর গ্রামীণ জীবনের মানোন্নয়ন ও শ্রমের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদেরও এগিয়ে যেতে হবে।

আমার শত ব্যস্ততা থাকলেও এবং একটু সময় পেলেই আমি গ্রামে চলে যাই। কেন যেন মনে হয় আমার শৈশবের গ্রামকে যদি ফিরে পেতাম! গ্রামের মেঠোপথটি যখন দূরে কোথাও হারিয়ে যায় আমার গলা ছেড়ে গাইতে ইচ্ছে করে, 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙ্গা মাটির পথ, আমার মন ভোলায় রে ...।'

*আমাদের গ্রামের মেয়েরা সবচেয়ে বেশি পশ্চাৎপদ। যুগ যুগ ধরে চলে আসা সামাজিক বিধিনিষেধ, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারাচ্ছন্নতার বেড়াজাল ভেঙে তাদের মেধা বিকাশের পথ করে দিতে হবে।*

শৈশব ও কৈশোরের স্কুলপাঠ্য বইয়ের গ্রাম সম্পর্কিত কবিতাগুলো আমার খুব সহজেই মুখস্থ হয়ে যেত। 'আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর', 'তুমি যাবে ভাই যাবে মোর সাথে আমাদের ছোট গাঁয়', 'বহুদিন পরে মনে পড়ে আজি পল্লীমায়ের কোল', 'বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ঐ', 'মেঘনা পারের ছেলে আমি', 'ছিপখান তিন দাঁড়, তিনজন মাল্লা', 'তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে'– এসব কবিতার লাইন এখনও মনে আছে।

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বর্ণদ্বারে পাঠিকা হিসেবে যখন আমি প্রবেশ করি, তখন তো আমি কিশোরী। পরে হয়েছিলাম ছাত্রী। গ্রামভিত্তিক উপন্যাস, গল্প ও কবিতা যখনই সুযোগ পেয়েছি, পড়েছি। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' আমাকে প্রথম ভীষণভাবে আচ্ছন্ন করে। এখনও হাতের কাছে পেলে পাতা ওল্টাই। দুর্গা ও অপু দু'ভাই-বোনের ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা, খুনশুটি, গ্রামময় ঘুরে বেড়ানো, কিছু পেলে ভাগাভাগি করে খাওয়া, অপুর প্রতি দুর্গার কর্তব্যবোধ, দুর্গার অসুখ ও মৃত্যু। অপুর দুঃখ ও দিদিকে হারানোর বেদনা, বুড়ি ঠাকুরমা'র অভিমান, দুঃখ-ব্যথা, অসহায়ত্ব। অপুর মা সর্বজয়া, দুঃখ-দারিদ্র্য যার নিত্যসঙ্গী, জীবনের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যার সংগ্রাম, সন্তানদের প্রতি স্নেহ-মমতা। অপু-দুর্গার বাবার প্রবাস চাকরি জীবন, দুর্গার মৃত্যুর পর তাঁর জন্য বাবার আনা শাড়ি, এসব ছোট ছোট দুঃখময় বাস্তব জীবনের বহু খণ্ড খণ্ড চিত্র তো বাংলাদেশের গ্রামজুড়ে আজও রয়েছে। 'পথের পাঁচালী' আমার নিজের গ্রামকেই মনে করিয়ে দেয়। বাংলা সাহিত্যে 'পথের পাঁচালী' শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথের গ্রামভিত্তিক ছোটগল্পগুলোও আমার ভীষণ প্রিয়। গ্রামকে নিয়ে শিল্পী জয়নুল আবেদীনের স্কেচগুলোও বাস্তব। কলাগাছের ঝোপে নোলক-পরা বউয়ের ছবিটি এখনও মনে পড়ে।

*বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' আমাকে প্রথম ভীষণভাবে আচ্ছন্ন করে। এখনও হাতের কাছে পেলে পাতা ওল্টাই।*

আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও মোটেই অনুল্লেখ করার মতো নয়। বাউল গান, বৈষ্ণব গান, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি মাঝির গান– এ সবই আবহমান কালের গৌরব।

গ্রামই আমাদের জীবন। আলোকোজ্জ্বল আধুনিক রাজধানী ও শহরকে বাঁচিয়ে রাখছে গ্রামীণ অর্থনীতি আর মানুষ। ছোট-বড় সব গ্রামকেই আমাদের ঐতিহ্য-অনুসারী আধুনিক ও আদর্শ গ্রাম হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

গ্রামোন্নয়নের জন্য সবার আগে প্রয়োজন সুষ্ঠু বিদ্যুৎব্যবস্থা। প্রতিটি গ্রামে আধুনিক সরঞ্জামসহ হাসপাতাল, স্কুল, মাতৃসদন, কৃষি ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, খেলার মাঠ প্রভৃতি থাকবে। ঘরবাড়ির অবস্থা মজবুত ও পরিচ্ছন্ন হবে। রাস্তাঘাট প্রশস্ত ও পাকা হবে, যানবাহন চলাচলে সুব্যবস্থা করে শহরের সঙ্গে যোগাযোগ সহজতর করে তুলতে হবে।

*ঘরবাড়ির অবস্থা মজবুত ও পরিচ্ছন্ন হবে। রাস্তাঘাট প্রশস্ত ও পাকা হবে, যানবাহন চলাচলে সুব্যবস্থা করে শহরের সঙ্গে যোগাযোগ সহজতর করে তুলতে হবে।*

কৃষিজমিগুলো সমবায়ের মাধ্যমে একত্র করে কৃষিব্যবস্থা ও উৎপন্ন দ্রব্যের সুষম বণ্টনসহ উৎপাদিত শস্য যাতে নির্ধারিত মূল্যে বাজারজাত করা হয় ও খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা স্বাস্থ্যসম্মত হয় তার উদ্যোগ নিতে হবে। সাধারণ মানুষের কাছে গ্রাম থেকে উৎপাদিত খাদ্যশস্য সহজপ্রাপ্য করে তুলতে হবে। যেসব উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী রফতানি হবে ও কাঁচামাল হিসেবে কারখানায় যাবে তার সুষ্ঠু সরবরাহ সরকারি ব্যবস্থাপনায় আনতে হবে। কৃষিকাজকে আধুনিকীকরণ করে বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনায় আনতে হবে। সারাবছর ধরে মৌসুম-অনুযায়ী সকল প্রকার ফসল দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ উৎপাদন করতে হবে। কোনো জমি পতিত পড়ে থাকবে না। নদ-নদী, খাল-বিল, দীঘি-পুকুরে মৎস্য চাষ করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য রেখে খামার গড়ে তুলতে হবে। সারাবিশ্বে আজ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবিত হচ্ছে। আমাদের এই দুঃখ-দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষের দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিকে জাতীয়ভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করলেই গ্রামের মানুষ শহরে এসে ভিড় জমাবে না। তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে ও কৃষি উপকরণ সহজ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করে সারাবছর কর্মব্যস্ত রাখতে হবে। আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুসারী গ্রামীণ কুটির শিল্পের মানোন্নয়ন করে ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে। গ্রামীণ কৃষিজাত পণ্য ও ছোট-বড় সকল ব্যবসায় এবং শিল্প বিকাশের পথ করে দিতে হবে। এর ফলে কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা হবে। আমি মনে করি আধুনিক বা যুগোপযোগী কৃষিব্যবস্থাই আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রধান হাতিয়ার হতে পারে। এ সঙ্গে যুগ যুগ ধরে শোষিত-বঞ্চিত হয়ে আসা অবহেলিত কৃষকদের পোড়-খাওয়া দুর্ভিক্ষ-দারিদ্র্যক্লিষ্ট ভাগ্যকেও পরিবর্তিত করে তাদের বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকারগুলো সুনিশ্চিত করতে হবে।

*সারাবছর ধরে মৌসুম-অনুযায়ী সকল প্রকার ফসল দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ উৎপাদন করতে হবে। কোনো জমি পতিত পড়ে থাকবে না।*

আমাদের গ্রামের মেয়েরা সবচেয়ে বেশি পশ্চাৎপদ। যুগ যুগ ধরে চলে আসা সামাজিক বিধিনিষেধ, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারাচ্ছন্নতার বেড়াজাল ভেঙে তাদের মেধা বিকাশের পথ করে দিতে হবে। তাদের শ্রমশক্তিকেও সমমর্যাদায় উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিয়োজিত করতে হবে। সামাজিক ক্ষেত্রে তারা নানা রকম অনাচার-অবিচারের শিকার হয়ে থাকে। মেয়েরা সর্বজনীন শিক্ষার সুযোগ পেলে, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে দাঁড়ালে, মননে-ব্যক্তিত্বে সাহসের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পেলে কোনো প্রকার নির্যাতন বা শোষণ তাদের অন্তরায় হয়ে থাকবে না। নিজের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম মেয়েদেরই শক্ত হাতে নিতে হবে। তবে রাষ্ট্রীয়ভাবে তার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করে তাকে সকল প্রকার সহযোগিতা করতে হবে।

*গ্রামবাংলার পথে-প্রান্তরে ক্ষেত-খামারে এ ধরনের অসংখ্য বিচিত্র জীবনের চরিত্র রয়েছে। দুমুঠো অন্নের আকাঙ্ক্ষায় যে কৃষক উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, চৈত্রের রোদে পুড়ে রুক্ষ ক্ষেতে লাঙ্গল টানে, বর্ষায় বুকসমান পানিতে ডুব দিয়ে পাট কাটে, শীতের প্রচণ্ড কাঁপুনি সহ্য করে ফসল কাটে– তার জীবনসংগ্রাম কি অন্য যে কোনো সংগ্রামের চেয়ে কম মূল্যবান?*

গ্রামের উন্নতিকল্পে আরও একটি বিষয় আমাকে ভীষণ রকম আতঙ্কিত করে তোলে। সেটি হলো, আমাদের সবচেয়ে অবহেলিত অসহায় অংশ পুষ্টিহীন কঙ্কালসার শিশুর সংখ্যাধিক্য। দেশের সর্বত্র আমি যে গ্রামেই গিয়েছি এ একই চেহারার শিশুদের দেখেছি। এসব শিশু যখন জন্ম নিচ্ছে, তখন অবশ্যই তাদের ভবিষ্যৎকে সম্ভাবনাময় ও নিরাপত্তাপূর্ণ করে তুলতে হবে। তাদের শৈশব-কৈশোর ও যৌবনকে আনন্দময় ও সুখময় ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেও আমাদের বর্তমানকে তাদের জন্য উৎসর্গ করার দৃঢ় মানসিকতা গ্রহণ করা উচিত এবং সে সঙ্গে সকলকে নিঃস্বার্থ হতে হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করে সক্ষম জনগণকে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে লাগাতে হবে।

গ্রামের উন্নয়ন প্রক্রিয়া বলতে আমি কোনো ছিটেফোঁটা বা সাময়িক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী নই। যুগ যুগ ধরে অন্ধকারে পড়ে থাকা পশ্চাৎপদ জীবনযাত্রার অভ্যস্ত প্রাচীন কৃষিব্যবস্থার প্রচলিত ধ্যান-ধারণার সামগ্রিক সংস্কার করে আধুনিক গ্রাম গড়ে তুলতে হবে। আমি কোনো অনুদানমূলক বা প্রতিশ্রুতিপূর্ণ উন্নয়ন নয়, 'টোটাল' বা 'সামগ্রিক' উন্নয়ন চাই। এজন্য প্রয়োজনবোধে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং শিক্ষিত সচেতন তরুণ সমাজকে কাজে নামাতে হবে।

গ্রাম-জীবনের অসংখ্য চরিত্র আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। আমাদের গ্রামের আক্কেলের মায়ের কথা খুব মনে পড়ে। বুড়ি হয়ে গেছে এখন। তিন ছেলে তার। অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিল। গ্রামের সব পাড়ায়, ঘরে ঘরে তার অবাধ যাতায়াত। সব ঘরের হাঁড়ির খবর তার নখদর্পণে। সে যেন গ্রামের গেজেট। কার ঘরে রান্না করতে হবে, পিঠে বানাতে হবে– সব কাজে আক্কেলের মা হাজির। আমরা যখনই গ্রামে যাই– পিঠা তৈরি বা তালের

ফুলুরি বানাতে তার ডাক পড়ত। পথে যেতে তার ঘরে একবার টুঁ মারলে পিঁড়ি পেতে বসাবেই, পান-সুপারিও খাওয়াবে। ধান কাটার মৌসুমে দক্ষিণ দিক থেকে অনেক লোক আসত। 'পরবাসী' নামে তারা পরিচিত। ধান কাটা, মাড়াই প্রভৃতি কাজ তারা করত। ছোট্ট খুপড়ি ঘর তুলে পুরো মৌসুমটা থাকত। ধান তোলা হলে নিজ নিজ অংশ নিয়ে তারা চলে যেত। বর্ষার মৌসুমে নৌকায় করে বেদেনীরা আসত। রং-বেরঙের কাচের চুড়ি আমাদের হাত টিপে টিপে পরিয়ে দিত। ফিতে, আলতা, চিরুনি, আয়না, নানা ধরনের খেলনা ও সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে বছরের নির্ধারিত সময়টিতে তারা ঠিক সময়মতো চলে আসত। আবার কখনো সাপের খেলা দেখাত, বাঁশি বাজিয়ে কত রকম গান শোনাত। গ্রামের বৌ-ঝিরা তাদের কাছে ভিড় জমিয়ে দেশি টোটকা ওষুধ নিত। ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি কত প্রকার তাবিজ তারা দিয়ে যেত সবাইকে। বিনিময়ে ধান-চাল-খুদ বা সবজি-ডিম-মুরগিও নিত।

*নির্জন দুপুরে*
*ভেসে আসে ঘুঘু*
*আর ডাহুকের*
*ডাক, মাছরাঙাটি*
*টুপ করে ডুব*
*দিয়ে নদী থেকে*
*ঠিকই তুলে*
*আনতে পারে*
*মাছ। এর চেয়ে*
*আর কোনো*
*আকর্ষণ, মোহ,*
*তৃপ্তি আর কোনো*
*কিছুতেই নেই*
*আমার।*
*ধূলি-ধূসরিত*
*গ্রামের জীবন*
*আমার আজন্মের*
*ভালোবাসা।*

গ্রামবাংলার পথে-প্রান্তরে ক্ষেত-খামারে এ ধরনের অসংখ্য বিচিত্র জীবনের চরিত্র রয়েছে। দুমুঠো অন্নের আকাঙ্ক্ষায় যে কৃষক উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, চৈত্রের রোদে পুড়ে রুক্ষ ক্ষেতে লাঙ্গল টানে, বর্ষায় বুকসমান পানিতে ডুব দিয়ে পাট কাটে, শীতের প্রচণ্ড কাঁপুনি সহ্য করে ফসল কাটে তার জীবনসংগ্রাম কি অন্য যে কোনো সংগ্রামের চেয়ে কম মূল্যবান?

আমি জানি আমার গ্রামের সে সুন্দর দিনগুলো আর কখনও ফিরে আসবে না। একে একে সব হারিয়ে গেছে। আমার সে চিরচেনা গ্রাম, জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত সে মানুষগুলোও নেই। নেই মানুষের সেই মন-জীবন। যুদ্ধে সবাই যেন আজ পরাজিত। সে কোমল সত্তারও মৃত্যু ঘটেছে। আজ শুধু বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতা। আর তাই বেড়েছে স্বার্থপরতা, সংঘাত। হারিয়ে গেছে ভ্রাতৃত্ববোধ, সঙ্কুচিত হয়েছে প্রসারিত হাত। জানি না এর শেষ কোথায়!

আমার জন্ম হয়েছে গ্রামে, শৈশবের রঙিন দিনগুলো উপভোগ করেছি গ্রামে। গ্রামীণ স্বভাব, চালচলন, জীবনযাত্রা ও মানসিকতার সঙ্গে আমার গভীর সম্পর্ক। এখনও একটু সময় ও সুযোগ পেলেই আমি হাঁপিয়ে উঠি বলেই গ্রামে চলে যাই। শহরের যান্ত্রিক ব্যস্ততম জীবন থেকে ছুটি নিয়ে গ্রামের নিরিবিলি নিঝুম শান্ত প্রকৃতিতে গেলে আমার দুচোখে শান্তির ঘুম নেমে আসে। রাজধানীতে এমন ঘুম পাওয়া কষ্টকর। এখানে বাতাস খুব ভারী, শ্বাস নিতেই তো কষ্ট। রাতের তারা-ভরা খোলা আকাশ অনেক বড় সেখানে। নিম, কদম, তাল-নারিকেল গাছের পাতা ছুঁয়ে ছন্দময় শব্দ তুলে ছুটে আসে মুক্ত বাতাস। জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা' যেন আমার গ্রাম– ঘন সবুজ প্রকৃতি ও ফসলের প্রান্তর দেখে,

দুচোখ জুড়িয়ে যায়। নির্জন দুপুরে ভেসে আসে ঘুঘু আর ডাহুকের ডাক, মাছরাঙাটি টুপ করে ডুব দিয়ে নদী থেকে ঠিকই তুলে আনতে পারে মাছ। এর চেয়ে আর কোনো আকর্ষণ, মোহ, তৃপ্তি আর কোনো কিছুতেই নেই আমার। ধূলি-ধূসরিত গ্রামের জীবন আমার আজন্মের ভালোবাসা। আমার হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি।

রচনাকাল: ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬
প্রকাশ: *সাপ্তাহিক রোববার*

# ছোটো 'পা তোর নকশি কাঁথা

মোহাম্মদ সাদিক*

ছোটো 'পা তোর নকশি কাঁথা বুনতে বুনতে নামল এসে
শীতের শিশির
তবু তো তোর শিল্পকলা শেষ হল না, শেষ হল না!
লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এ কোন কাঁথা বুনলি আপা!
এ কোন নিখুঁত গাছ-গাছালি; স্বচ্ছ বকুল, অশ্রুবিন্দু!
হাতের আঙুল সুচের ডগায় বিদ্ধ হয়ে লালচে আবির-
লাগল কাঁথার কোমল বুকে
তবু তো তোর শিল্পকলা শেষ হল না, শেষ হল না!

লতার মতো জড়িয়ে থাকা সবুজ রেখা
লুকিয়ে থাকা ফুলের কুঁড়ি, রুপোর কাঁকন, ঢাকাই শাড়ি
ধীর গতিতে হাতের কাঁটা যাচ্ছে বুনে সময় থেকে সময় নিয়ে
সব সকালের সব বিকেলের চিহ্ন আঁকা
ছোটো 'পা তোর নকশি কাঁথা আসবে কবে আমার ঘরে?

ঢাকবে কবে আমার শরীর?
ওই তো শীতের হিমেল হাওয়া আসছে ছুটে
ঝরিয়ে দিতে স্বপ্ন-সুখের শোভন পাতা
ছোটো 'পা তুই বুনলি কেবল তরতাজা সব ফুলের ছবি, ধানের ছড়া
বিহান বেলার দোয়েল-শালিক, প্রজাপতি
প্রসন্ন সব শাপলা শালুক
পালকি এবং পাখির পালক ।
শীতের তোড়ে কাঁপছি আমি, কাঁপছে আজো
করুণ স্বদেশ
লক্ষ লক্ষ বছর ধরে একটি কাঁথা বুনলি আপা!
তবু তো তোর শিল্পকলা শেষ হল না, শেষ হল না!

*কবি; বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান

# অসাম্প্রদায়িক বাংলাভাষা : দেশীয় ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন*

## ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র বাংলাদেশ

আমাদের প্রিয় দেশ বাংলাদেশ ছাড়া আর কোনো ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র আছে কি-না তা আমার জানা নেই। প্রায় সত্তর বছর আগে ১৯৪৮ সাল থেকে মায়ের ভাষার মান-মর্যাদা ও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে একে প্রতিষ্ঠিত করার দুর্বার আন্দোলন শুরু হয়। এতে অন্যান্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌবনদীপ্ত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পরবর্তীকালে 'জাতির পিতা' ও 'বঙ্গবন্ধু' অন্যতম মুখ্য ভূমিকা রাখেন। মাধবপুর থানার জগদীশপুর যোগেশচন্দ্র হাইস্কুলে তখন আমি পঞ্চম শ্রেণির কিশোর ছাত্র, প্রতিদিন "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" শ্লোগান দিয়ে ইটাখোলা রেলস্টেশন পর্যন্ত দারুণ উৎসাহে পদযাত্রা মিছিলে যোগ দিতাম। তখন মনে আশা ছিল, একদিন বাংলাভাষা তদানীন্তন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে। কিন্তু কখনো ভাবতেই পারিনি যে, একদিন স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, যাকে "দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে সোনার বাংলা রূপে" গড়ে তুলতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, নেতৃত্বে অনন্য, গৌরবে দীপ্ত ও সংকল্পে অটুট হয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবসকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করাতে পারবে।

## একুশে ফেব্রুয়ারি : শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

উইকিপিডিয়ার সংজ্ঞা অনুসারে, "International Mother Language Day (IMLD) is a worldwide annual observance held on 21 February to promote awareness of linguistic and cultural diversity and promote multilingualism. First announced by UNESCO on 17 November 1999, it was formally recognized by the United Nations General Assembly in a resolution establishing 2008 as the International Year of Languages."

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০০০ সাল থেকে সারাবিশ্বে প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে উদ্‌যাপন করা হয়। দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয় যথাযোগ্য মর্যাদা ও গুরুত্ব

*বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর; ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য (১৯৯৬-৯৮); বর্তমানে অর্থনীতির ভিজিটিং প্রফেসর

সহকারে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি (৮ই ফাল্গুন) তারিখ ঢাকায় ভাষা শহীদদের আত্মোৎসর্গের স্মরণেই এ শহীদ দিবস তথা বিশ্বের প্রতিটি দেশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের জন্ম-ঘটনা ও সময়-নির্ঘণ্ট বাঙালিজাতির জন্য লিপিবদ্ধ হয়ে আছে গৌরবের মহিমায়। একজন মনে-প্রাণে খাঁটি বাঙালি হিসেবে স্মরণ করছি, ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকেই বাঙালিদের মোহ ভঙ্গ হয়। বুঝতে কষ্ট হয় না যে, পাকিস্তানিরা বাংলাভাষা ও সংস্কৃতিসহ প্রশাসন ও অর্থনীতিতে কখনো সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাপ্পান্ন ভাগ বাঙালিকে ন্যায্য হিস্যা দেবে না। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা একমাত্র উর্দুই হবে এ ঘোষণা ও প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সনের নভেম্বর মাসে ড. মুহম্মদ এনামুল হক পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উর্দু ও বাংলা শীর্ষক একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "বাংলাকে ছাড়িয়া উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা রূপে পূর্ব পাকিস্তানবাসী গ্রহণ করিলে তাহাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মৃত্যু অনিবার্য।" এরপর বহু সংগ্রাম, ত্যাগ, তিতিক্ষা, চড়াই-উৎরাই পার হয়ে দেশ স্বাধীন হয়, বাংলাকে করা হয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা। সামনে চলে আসে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের হাতছানি। 'আ-মরি বাংলা ভাষা' হৃদয়-গভীরে ধারণ করে রফিকুল ইসলাম কানাডার ভ্যানকুবার থেকে ১৯৯৮ সালের ৯ই জানুয়ারি তারিখে জাতিসংঘের মহাসচিব কফি এ. আনানকে একটি চিঠি পাঠান। এতে তিনি জাতিসংঘকে ঘটনাচক্রে পৃথিবীর মৃতপ্রায় ভাষাগুলোকে পুনরুজ্জীবন ও সংরক্ষণের জন্য একটি প্রস্তাবসহ সব রকম কর্মকা- গ্রহণের সুপারিশ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রস্তাব উত্থাপনের বাধ্যবাধকতায় ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভার প্রস্তাব ইউনেস্কো কাউন্সিলে সিদ্ধান্ত নম্বর (A/RES/61/266) সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। তবে আজকের দিনে অবশ্যই স্মরণ করতে হয় যে, তদানীন্তন ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জনবন্ধু শেখ হাসিনা মন্ত্রিসভার অপরিসীম দক্ষতা, অভূতপূর্ব গতি ও গভীর মমত্ববোধে এক সপ্তাহের মধ্যেই সমস্ত রীতিনীতি অনুসরণ করে মন্ত্রিসভার প্রস্তাব প্যারিসে ইউনেস্কো-র সদর দপ্তরে যথাসময়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী জনাব এ. এইচ. এস. কে. সাদেক এবং ফ্রান্সে ও ইউনেস্কো-তে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তথা স্থায়ী প্রতিনিধি সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলীর আন্তরিক ও সময়োচিত বলিষ্ঠ অবদানও এ অধ্যায়ে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এ উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি উদ্‌যাপনে আনন্দ প্রকাশের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রথমবারের মতো একটি স্বর্ণ স্মারক মুদ্রা অবমুক্ত করা হয় ৩০শে নভেম্বর ১৯৯৯ তারিখে।

## হিন্দুদের বর্ণবিভাজন ও মুসলমানদের বিদেশি আশরাফ ও দেশি আশরাফ শ্রেণি

বাংলাভাষা যে বাঙালিদের জন্য সর্বজনীন সেই অসাম্প্রদায়িকতা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা না গেলেও বর্তমান স্বল্পপরিসর নিবন্ধে কিছু তথ্য-উপাত্ত পেশ করা জরুরি বলে মনে করছি। বিশ্বনন্দিত পর্যটক দার্শনিক আল বিরুনিকে উদ্ধৃত করে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার (আর. সি. মজুমদার) লিখেছেন, "Believe nothing in which they (Hindus) believe and vice versa" (মুসলিম বাংলা সাময়িক পত্র : ১৮৩১-১৯৩০,

বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৯)। আর. সি. মজুমদার লক্ষ করেছেন, আল বিরুণি হিন্দু ও মুসলমানরা কীভাবে সর্বক্ষেত্রেই একে-অন্যের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষা, ধর্ম, চলন-বলন ও নিয়মাবলি পালন করে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। হিন্দুরা মুসলমানদের 'ম্লেচ্ছ' অর্থাৎ অপবিত্র বলে তাদের সঙ্গে কোনো রকম মেলামেশা না করার ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ করতেন। দু-জাতির মধ্যে বিবাহ বা অন্য কোনো প্রকার সম্পর্ক স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা ছিল। এমনকি একে-অন্যের পাশে বসা বা একসঙ্গে পানাহার করাও বারণ ছিল। কারণ তাতে হয়তো-বা তারা কলুষিত হয়ে যেতে পারতেন। ভিনদেশিদের (মুসলমানদেরকে তাই মনে করা হতো) স্পর্শ করা আগুন বা পানি হিন্দুদের অপবিত্র করে দিত বলে তারা মনে করতেন। চৌদ্দ শতকের কবি বিদ্যাপতিও মুসলমানদের তুর্কি বলে চিহ্নিত করেছিলেন। পঞ্চদশ শতকের কবি বিপ্রদাশ তুড়ুক (তুর্কির অপভ্রংশ), যবন ও মুসলমান শব্দগুলো পরস্পরের স্থানান্তরযোগ্য বলে মনে করতেন। ষোলো শতকের চৈতন্যমঙ্গল-এ জয়ানন্দ জানালেন, "ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে" (জয়ানন্দ, *চৈতন্যমঙ্গল*, বিমানবিহারী মজুমদার ও সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত : এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯৭১)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমিরেটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান অনমনীয় বর্ণাশ্রম, কঠোর অস্পৃশ্যতা এবং পবিত্র-অপবিত্রের কঠিন রীতিনীতি নিয়ে বিভক্ত হিন্দু সমাজকে এক ও অখ- বিবেচনা করা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে তিনি সামাজিক উদ্ভবের মাপকাঠিতে বাংলার মুসলমানরা আশরাফ বা সম্ভ্রান্ত অভিজাত (সৈয়দ, মুঘল ও পাঠান) এবং আতরাফ অর্থাৎ নিম্নশ্রেণির মানুষ– এই দু-ভাগে বিভক্ত বলে প্রমাণ পান। আশরাফগণের ভাষা বিদেশি আরবি, ফারসি এমনকি তুর্কি বা তুরুক ছিল। আতরাফ সমাজ গঠিত হয়েছিল দেশীয় অর্থাৎ প্রধানত ধর্মান্তরিত মুসলমানদের দ্বারা। তাদের ভাষা ছিল বাংলা ও সংস্কৃত (বাংলার মুসলমানদের পরিচয় বৈচিত্র্য : অষ্টাদশ শতাব্দী অবধি- জ্ঞানতাপস আব্দুর রাজ্জাক গুণিজন বক্তৃতা-৩, ২০১৭, ড. আনিসুজ্জামান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

## বাংলা সন গণনা

ব্রিটিশ শাসককুল এদেশে বাণিজ্য করতে এসে মূলত সংস্কৃত ভাষায় রচিত হিন্দুদের গ্রন্থসমূহ এবং ফারসি ভাষায় রচিত মুসলমানদের গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলিম রীতিনীতি, সংস্কৃত ও চিন্তাচেতনা বোঝার জন্য রীতিমতো সংস্কৃতি টোলে এবং মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে ওইসব ভাষা শিখে নেয়। এখানে বাংলা ভাষার বিবর্তন ও আদি ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় যাবার অবকাশ নেই। তবে শাসককুল বাংলা ভাষার অগ্রগতিতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত হয়তো-বা তেমন কোনো আগ্রহ বোধ করেনি। তবে ইঞ্জি-নয়ার সাঈদ আহমেদের গবেষণা থেকে জানা যায় যে, দীর্ঘদিন পর্যন্ত মনে করা হত বাংলার সুবিখ্যাত সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলে অথবা রাজা শশাঙ্কের সময়ে বাংলা সন গণনা শুরু হয়েছিল। কিন্তু হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যার কঠিন গণিতের সাহায্যে এক অসাধারণ গবেষণার মাধ্যমে সাইদ প্রমাণ করেছিলেন যে, ৯৯২ হিজরি মোতাবেক ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট জালালউদ্দিন আকবরের সময় প্রথম বাংলা সনের প্রবর্তন

ও গণনা শুরু হয়। তবে পহেলা বৈশাখ ১ বাংলা সন-তারিখ হিজরি থেকে রূপান্তরের সময় ৯৫১ হিজরি মোতাবেক ১৫৪৪ খ্রিস্টাব্দে (ইঞ্জিনিয়ার সাইদ আহমেদ, বঙ্গাব্দের ইতিহাস, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ২০১৫)

## বাংলা একটি অসাম্প্রদায়িক ভাষা

হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে রেষারেষি, বিরোধ, বিভিন্নতা ও তিক্ততা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার শেষ নেই। এমনকি এমন ধারণাও কেউ কেউ দিয়ে থাকেন যে, বাংলা হচ্ছে হিন্দুদের ভাষা। বিচ্ছিন্নভাবে যখন-যেমন করে কিছু কিছু লেখকের উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। কিন্তু বিগত কয়েক শতকে বাংলাভাষা শুধু ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যেমন সম্প্রসারিত ও গৃহীত হয়েছে তেমনি অনেক কীর্তিমান মুসলমান কবি-সাহিত্যিক, ভাষাবিদের অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা ভাষার অসাম্প্রদায়িক রূপটি জোরালো ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে চিত্রিত করেছেন তাঁদের সাহিত্যকর্মে। দীনেশচন্দ্র সেন বঙ্গভাষার সম্প্রসারণ শক্তি আশ্চর্য বলে উল্লেখ করে লিখেছেন যে, "ইহা (বাংলাভাষা) প্রাচীনকাল হইতেই আপনাকে দেশ দেশান্তরে ছড়াইয়া দিয়াছিল। বালীদ্বীপের তাম্রশাসন ও শিলালিপিগুলি তৎসময়ের প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে উৎকীর্ণ।" জাপানের পুরোহিতগণ ধর্মপুস্তক লিখতে দ্বাদশ শতাব্দীর বঙ্গাক্ষর এখনো ব্যবহার করে থাকেন। বৌদ্ধযুগে বাঙালিগণ পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র তাদের ধর্মপ্রচার করেছিলেন। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও মুহম্মদ এনামুল হক *আরাকান রাজ্যসভার বাঙ্গালা সাহিত্য (১৬০০-১৭০০ খ্রিস্টাব্দ)* নামক গবেষণাগ্রন্থে খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকান অর্থাৎ রোসাঙ্গ (রোহিঙ্গাদের) দেশে বাংলা সাহিত্যের সম্প্রসারণ, সমাদর ও সম্মানের কথা লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে কবি দৌলত কাজী (১৬০০-১৬৩৮ খ্রি.) ও তাঁর অসমাপ্ত কাব্য *সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী* প্রসঙ্গটি সবিস্তার বর্ণনা করেছেন। এই গবেষণা গ্রন্থের ভূমিকায় ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে দীনেশচন্দ্র সেন, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদকে *দ্রোণাচার্য* সদৃশ এবং মুহম্মদ এনামুল হককে "অর্জুনতুল্য" বর্ণনা করে লিখেছিলেন, "এই পুস্তকখানি এবং বঙ্গপল্লীর প্রাচীন গীতিকাগুলি পাঠ করিলে স্পষ্টই দৃষ্ট হইবে যে, কিছুদিন পূর্বেই বঙ্গভাষায় হিন্দু কি মুসলমানদের নিজস্ব বলিয়া কোন ছাপ ছিল না– ইহা উভয় সম্প্রদায়েরই মাতৃভাষা বলিয়া গণ্য ছিল; কোন সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের সঙ্গে ইহার একেবারেই সংশ্রব ছিল না।"

# আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্মবাণী

যতীন সরকার*

মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মোৎসর্গ করেছিলাম যে-দিনটিতে, আমাদের সেই পরম গৌরবের একুশে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' রূপে বিশ্বস্বীকৃতি লাভের ফলে আমরা অবশ্যই আরও অনেক বেশি গৌরবান্বিত হয়েছি। খ্রিস্টীয় ২০০০ সাল থেকেই একুশে ফেব্রুয়ারি সারা পৃথিবীতে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' রূপে পালিত হচ্ছে। এতে বাঙালিরা তো বটেই, পৃথিবীর অন্য অন্য জাতির মানুষও নিজ নিজ মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বাঙালিদের ভেতর তো সেই ২০০০ সালেই উচ্ছ্বাসের বান ডেকে গিয়েছিল। ওই বছরেই ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বাঙালিরা হিন্দির দাপট থেকে তাঁদের মাতৃভাষা বাংলাকে রক্ষায় বিশেষ সচেতন ও কৃতসংকল্প হয়ে উঠলেন, অবিলম্বে রাজ্যের সকল কাজকর্ম বাংলায় সম্পন্ন করানোর আন্দোলনে নামলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও সে-বছরই রাজ্য সরকারের কাজকর্মে বাংলা চালু করার ঘোষণা দিলেন। শুনেছি, ত্রিপুরা রাজ্যেও সে-রকম ব্যবস্থাই গৃহীত হচ্ছে।

এ-সব খবরে, স্বাভাবিক ভাবেই, আমরা গৌরববোধে পরিতৃপ্ত হচ্ছি। কিন্তু এ-রকম পরিতৃপ্তির বৃত্তাবদ্ধ হয়ে থাকা মোটেই সঙ্গত নয়। পরিতৃপ্তির বদলে বরং দায়িত্বসচেতন হয়ে ওঠাই বিশেষ রূপে কাঙ্ক্ষিত। সবার আগে সেই দায়িত্বসচেতনতার জাগরণ ঘটতে হবে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে। কিন্তু সে-প্রজন্মের ভেতর সে-রকম জাগরণ ঘটেছে কি? আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি কীভাবে কাদের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদায় উন্নীত হলো– আমাদের এখনকার শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের কতজন সে-সম্পর্কে অবহিত?

এ-সব প্রশ্নের উত্তর-অন্বেষণ করতে গিয়ে আমি খুবই হতাশ হয়েছি। খুব অল্প সংখ্যক তরুণকেই আমি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সম্পর্কে অবহিত হতে দেখেছি। যাঁদের সক্রিয় উদ্যোগে আমাদের জাতীয় দিবসটি আন্তর্জাতিক দিবসে পরিণত হলো তাঁদের নাম জানে– এমন একজন তরুণ বা তরুণীকেও আমার পরিচিত পরিমণ্ডলে খুঁজে পাইনি।

এ-কারণেই, প্রতিবছর একুশে উপলক্ষে পত্র-পত্রিকায় যে-সব ক্রোড়পত্র ছাপা হয় কিংবা

*শিক্ষাবিদ ও চিন্তাশীল প্রবন্ধ লেখক

একুশেকে নিয়ে যে-সব সংকলন বের হয়, সেগুলোতে ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সম্পর্কীয় তথ্যাবলিও সংযোজিত হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

বিদেশে বসবাসরত বিভিন্ন দেশের কয়েকজন মাতৃভাষাপ্রেমী মানুষ এক সময়ে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। এ-রকম সচেতনতা থেকেই 'মাতৃভাষা প্রেমিক সংগঠন' গড়ে ওঠে কানাডা-প্রবাসী বিভিন্ন ভাষাভাষী একদল মানুষের উদ্যোগে। এঁদের ভেতর ছিলেন ইংরেজিভাষী জাসন মোরিন ও সুসান হডগিন্স, ক্যান্তানিজভাষী ডক্টর কেলভিন চাও, জার্মানভাষী বিনেতে মার্কিমস্, হিন্দিভাষী কল্পনা জোশি এবং বাংলাভাষী রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালামসহ আরও অনেকজন। আপন আপন মাতৃভাষার প্রতি এঁদের সকলেরই ছিল অপরিসীম ভালোবাসা। সেই ভালোবাসার টানেই এঁরা সকলে মাতৃভাষার জন্য প্রাণোৎসর্গকারী বাঙালি শহীদদের কথা স্মরণ করলেন গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে। এঁদেরই প্রয়াসে বাঙালি জাতির শহীদ দিবস একুশে ফেব্রুয়ারি পেয়ে গেল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সম্মান।

সেই সম্মানপ্রাপ্তির প্রধান হেতুটির সন্ধান করতে গেলেই আমরা দেখতে পাব যে, মাতৃভাষার মাধ্যমেই প্রকাশিত হয় মানুষের মৌলিক পরিচয়। পশুর সঙ্গে মানুষের প্রধান পার্থক্য হলো: পশুর ভাষা নেই, মানুষের ভাষা আছে। তাই বলে মানুষ কিন্তু ভাষা নিয়েই জন্মায় না। জন্মের পর সমাজের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হয়েই মানুষ ভাষার অধিকারী হয়ে ওঠে। বলা যেতে পারে, মানুষ ভাষার অধিকারী হওয়ার সম্ভাবনা নিয়েই জন্ম নেয়; সেই সম্ভাবনাকে বাস্তব করে তুলেই সে আস্তে আস্তে মানুষ হতে থাকে, পশুর সঙ্গে তার পার্থক্য দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। অর্থাৎ পশু জন্ম থেকেই পশু। অন্যদিকে মানুষ জন্ম থেকেই মানুষ নয়; জন্মের পর তাকে মানুষ হয়ে উঠতে হয়। ভাষা আয়ত্ত করেই তার মানুষ হয়ে ওঠা। মানুষ যে-ভাষার আশ্রয়ে মানুষ হয়, সেটিই তার মাতৃভাষা।

সাধারণভাবে যদিও আমরা মায়ের ভাষাকেই বলি মাতৃভাষা, তবু এমন বলাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। আসলে মাতৃভাষা মানে 'মাতৃস্বরূপিনী ভাষা'। অর্থাৎ এ-ভাষা নিজেই মা। গর্ভধারিণী মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েই পশু ও মানবশিশু উভয়েরই জন্ম হয়। কিন্তু মানবশিশুর জন্মের পর আরেক মায়ের কোলে বেড়ে উঠে তাকে নতুন করে জন্ম নিতে হয়, সেই মা-ই তার মাতৃভাষা। গর্ভধারিণী মায়ের কোল পরিত্যাগ করেই মানুষকে জীবনধারণ করতে হয়, কিন্তু ভাষা-মায়ের কোলে তাকে সারাজীবনই অবস্থান করতে হয়। কোনো মতেই সেই মাকে ছেড়ে যাওয়া যায় না।

বিষয়টিকে আরেকটু স্পষ্ট করার জন্য বলি: কোনো মানবশিশুকে যদি জন্মের পরই তার গর্ভধারিণী মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সম্পূর্ণ অন্য পরিবেশে ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে নিয়ে ফেলা যায়– এবং সেখানেই সেই মানুষটি লালিত পালিত হতে থাকে যদি– তবু সে অবশ্যই বেঁচে থাকবে এবং মনুষ্যত্ব লাভ করবে। তবে এ-রকম পরিবেশে যে-মনুষ্যত্ব সে-লাভ করবে সে-মনুষ্যত্বের মাধ্যম তার গর্ভধারিণী মায়ের ভাষা হবে না, হবে ভিন্ন

পরিবেশে যে-ভাষার পরিমণ্ডলে সে বেড়ে উঠল সেই ভাষা এবং সেই ভাষাই হবে তার মাতৃভাষা।

এই মাতৃভাষাই মনুষ্যত্বের ধারক, এবং এই মাতৃভাষার ক্রোড়চ্যুত হলে মানুষের মনুষ্যত্বই হারিয়ে যাবে। সচেতন মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে যাওয়াকে যে-কোনোমতেই বরদাস্ত করতে পারে না, তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'। ফেব্রুয়ারির একুশেই বাঙালির সমগ্র সত্তায় গ্রথিত করে দেয় 'একুশের চেতনা'।

এই 'একুশের চেতনা' শুধু বাঙালি জাতিরই বৃত্তাবদ্ধ হয়ে থাকে না, সারা পৃথিবীর মাতৃভাষাপ্রেমী মানুষের চৈতন্যে তা ঝড় তোলে। বিশেষ করে এই মানুষেরা মাতৃভূমির বাইরে বিভাষী পরিমণ্ডলে অবস্থান করে যখন, তখন তাদের অন্তরের সেই 'ঝড়ের মাতন' অতি সহজেই 'বিজয় কেতন' উড়িয়ে দিয়ে জাতির গণ্ডি ভেদ করে যায়, হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক।

কিন্তু আন্তর্জাতিক হলেও এর উৎসটি তো জাতীয়। সেই উৎসেই যাদের উদ্ভব, সেই বাঙালি জাতির মানুষের উপর 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' যে অনেক গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে সে কথা তো কোনো মতেই অস্বীকার করা যাবে না। প্রশ্ন হচ্ছে– আমরা বাঙালিরা– কি সেই দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন? সেই দায়িত্ব সম্পাদনে আমরা কি সক্রিয়? মাতৃভাষার বদলে পরভাষা-প্রীতিই কি আমাদের ভেতর প্রবল হয়ে উঠছে না?

প্রশ্নগুলোর মুখোমুখি আমাদের দাঁড়াতেই হবে।

এক সময়ে পরভাষার আধিপত্যের হাত থেকে মাতৃভাষাকে বাঁচানোর লক্ষ্যে আমরা সচেতন ও সক্রিয় হয়ে উঠেছিলাম। সেই সচেতনতা ও সক্রিয়তার বিস্তৃতি ঘটার ফলেই আমরা অনেক ভ্রান্তিবিলাসের হাত থেকেও মুক্ত হতে থাকি, হয়ে উঠি মুক্তিসংগ্রামী। মুক্তিসংগ্রামী বাঙালির সংগ্রাম শুধু পরভাষার আধিপত্যের বিরুদ্ধেই ছিল না, ছিল পররাষ্ট্রের শাসন-শোষণ থেকে মুক্তিলাভের জন্য আপন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

মরণপণ সংগ্রামে জয়ী হয়ে যে-স্বাধীন স্বরাষ্ট্রটি লাভ করলাম, সে-রাষ্ট্র যে পরভাষার আধিপত্য মুক্ত হবে– তেমনটিই তো ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু সেই স্বাভাবিক ঘটনাটিই ঘটছে না।

ঘটছে না এ-কারণে যে, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের চরণে আজ আমরা নতমস্তক। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদারক্ষার জন্য দায়িত্ব-চেতনার স্থান দখল করে নিয়েছে তথাকথিত আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজির প্রতি সীমাহীন আসক্তি। যে-কোনো ভাষাই যে আসলে কোনো-না-কোনো জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা তথা জাতীয় ভাষা, এবং আন্তর্জাতিক ভাষা বলে কোনো ভাষার অস্তিত্বই যে থাকতে পারে না,– বিশ্বায়নের ধাক্কায় এই অবিতর্কিত সত্যটিকেই আমরা ভুলে বসে আছি। আর 'বিশ্বায়ন' কথাটি যে সাম্রাজ্যবাদের নিছক স্তুতি ছাড়া আর কিছুই নয়– এই সত্যটির দিক থেকেও আমরা চোখ ফিরিয়ে রেখেছি। এ-রকম

সত্যান্ধ হওয়ার ফলেই মাতৃভাষার প্রতি আমাদের অবজ্ঞা একেবারে কুণ্ঠাহীন হয়ে উঠেছে। এ-রকম কুণ্ঠাহীন অবজ্ঞার বশেই ছেলেমেয়েদের ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলে পাঠিয়ে আমরা আভিজাত্য-গৌরবে টইটুম্বুর হয়ে উঠি। মাতৃভাষাকে নিগড়মুক্ত করার লক্ষ্যে সংগ্রামে নেমেই মাতৃভূমিকে বিজাতীয় শাসনমুক্ত করে স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছে যে-জাতি, সে-জাতিই যখন মাতৃভাষার বদলে পরভাষায় কৃতবিদ্য হওয়াকেই কৃতির পরাকাষ্ঠা বলে বিবেচনা করে, সে-জাতির পতন ও সর্বনাশকে তখন ঠেকিয়ে রাখবে কে?

আমরা অবশ্যই পরভাষার বিদ্বেষী নই, কোনোকালেই তেমন ছিলাম না। অতীতকালেও আমরা বিভিন্ন পরভাষার সঙ্গে সম্প্রীতি রক্ষা করে চলেছি, বিভিন্ন ভাষার ভাণ্ডার থেকে রত্নমাণিক আহরণ করে মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করে তুলতে কোনোকালেই আমাদের কুণ্ঠা ছিল না। ইংরেজ জাতির অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম যখন, তখন আমরা স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজ-শাসনের বিরোধিতা করেছি, কিন্তু ইংরেজি ভাষার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিনি। বরং সেকালের বাংলার সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, 'অনন্তরত্ন-প্রসূতি ইংরেজি ভাষার যতই অনুশীলন হয়, ততই ভালো।' কিন্তু তিনি সেই সঙ্গে 'সুশিক্ষিত বাঙ্গালিদিগের অভিপ্রায় সকল বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত' করার গুরুত্ব ও আবশ্যকতা সম্পর্কে সকলকে সচেতন করে দিয়েছেন। আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তো ইংরেজ আমলে 'পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার' এবং 'সেথা হতে সবে আনে উপহার'– এমনটি দেখে আনন্দিতই হয়েছিলেন। কিন্তু পশ্চিমের ইংরেজি-জাহাজ বাহিত জ্ঞানকে যে বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দিতে হবে দেশি ভাসা তথা মাতৃভাষার ডিঙ্গি নৌকার সাহায্যেই– এ-কথাটা তিনি নানাভাবে বারবার দেশের মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আর কবিগুরুর আশীর্বাদ-ধন্য বিশ্বখ্যাত বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন বসুর নির্দ্বিধ প্রত্যয় ছিল যে, "বিদেশী ভাষাই আমাদের দেশে সাক্ষরের সংখ্যাবৃদ্ধির অন্তরায়। বিদেশী ভাষা শিক্ষার বাহন হলে মুখস্থ করবার প্ররোচনা দেয় ছাত্রদের এবং এর ফলে তাদের মৌলিক চিন্তার প্রসার ঘটতে বাধার সৃষ্টি করে।"

সর্বস্তরে শিক্ষার বাহন হবে বাংলা ভাষা– বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা সত্যেন বসুর এমন অভীপ্সা বিদেশি ইংরেজ-শাসনে বাস্তবায়িত হতে পারেনি। কিন্তু, দুঃখ এই, রক্তের মূল্যে অর্জিত স্বাধীন দেশেও তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

স্বাধীন বাংলাদেশে অগণন শহীদের রক্তে লেখা রাষ্ট্রীয় সংবিধানটির বিধানও অনবরত অনায়াসে লঙ্ঘিত হয়। 'প্রজাতন্ত্রের ভাষা হবে বাংলা'– সংবিধানে স্পষ্ট ভাষায় এমন কথা লেখা থাকলেও, এবং প্রজাতন্ত্রের সকলের জন্য অভিন্ন ধারার শিক্ষা প্রদানের কথা সংবিধানে বিধিবদ্ধ হলেও– দেশে বিভিন্ন ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু আছে, ভাগ্যবানের সন্তানদের জন্য এখানে-ওখানে ইংরেজি-মাধ্যম স্কুল-কলেজ শিকড় গেড়ে বসেছে। রাষ্ট্রের উচ্চ আদালতে তো চলছে ইংরেজিরই প্রায়-সর্বাত্মক ব্যবহার। এ-ব্যবস্থাটিও যে-সংবিধানসম্মত নয়, সে-কথা অনেকেই বলছেন। একজন সাবেক বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী তো 'উচ্চ আদালতে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পরিবর্তে ইংরেজির ব্যবহারকে নাগরিক ও মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন' বলেই মত প্রকাশ করেছিলেন। একটি সংবাদপত্রের সঙ্গে

আলাপচারিতায় তিনি আরও বলেছিলেন,–

"আদালত একটি জনস্থান (পাবলিক প্লেস)। বিচারপতি রায়টি পড়ে শোনান। কিন্তু রায়ে কী বলা হলো, তা যদি আদালতে উপস্থিত বিচারপ্রার্থী না-বুঝতে পারেন তাহলে সেটা আরবীতে ফতোয়া জারির মতো ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কেননা ইংরেজিতে রায় দেয়ার কারণে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না তাকে কী শাস্তি দেয়া হলো এবং কেন দেয়া হলো। এছাড়া আদালতে শুধু রায় দিলেই চলে না, তা যাতে সকলে মেনে চলতে পারে, সে-বিষয়টাও ভাবতে হবে। এ জন্যই উচ্চ আদালতে বাংলায় রায় দেয়া প্রয়োজন"। (*'আমাদের সময়'*, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬)

এ-রকম অনেক 'প্রয়োজন'ই তো রয়েছে। সে-সব প্রয়োজন নিশ্চয়ই আপনা থেকে সাধিত হয়ে যাবে না। যেভাবে অবিরাম সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মাতৃভূমিকে পরশাসন থেকে মুক্ত করেছি, সে-রকম সংগ্রামের মধ্য দিয়েই কেবল আমাদের সকল 'প্রয়োজন' পরিপূরণ করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস রূপে একুশে ফেব্রুয়ারির বিশ্বস্বীকৃতি সেই সংগ্রামেরই তাগিদ নতুন করে নিয়ে এসেছে।

মাতৃভাষার অধিকার তো মানবাধিকারেরই অন্তর্গত একটি বিষয়। পৃথিবীর সকল জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষাগুলো শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান করবে, এক ভাষা অন্য ভাষাকে দমনের বদলে পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে, একভাষার সমৃদ্ধি আরেক ভাষাকে ঋদ্ধ করে তুলবে, ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষাকেও বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বিশ্বের সকল মানুষ সক্রিয় প্রয়াসে নিয়োজিত হবে– এই সবই তো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্মবাণী। সেই মর্মবাণীকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করার ও তাকে কর্মে রূপায়িত করে তোলার সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব তো 'একুশে'র দেশের মানুষ হিসেবে আমাদেরই। বিশ্বায়নের ছুঁতায় কোনো পরভাষাই যাতে আমার মাতৃভাষার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশকে ব্যাহত করতে না-পারে সে-ব্যাপারে সকলের থাকতে হবে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা। বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত থাকার জন্য ইংরেজির মতো একটি সমৃদ্ধ ভাষার অনুশীলন আমরা অবশ্যই করব, এবং সেটি ভালোভাবেই করব। আমাদের মাতৃভাষা বাংলার সঙ্গে সঙ্গে সকলের জন্যই থাকবে ইংরেজি শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা। ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষা থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল সম্পদ আহরণ করে আমাদের মাতৃভাষার জ্ঞানভাণ্ডারকে প্রতিনিয়তই সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে। কিন্তু একটি ইংরেজি-শিক্ষিত সুবিধাভোগী গোষ্ঠী জনসাধারণের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাবে– এমনটি কিছুতেই হতে দেওয়া যাবে না। ইংরেজি-মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ পণ্যশালায় পরিণত বিদ্যাবিক্রয় কেন্দ্রের প্রসার অবশ্যই রুখতে হবে, দেশের সকল নাগরিকের জন্য অভিন্ন শিক্ষাপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। সেই সঙ্গে দেশের সকল ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মাতৃভাষার উন্নয়ন ও বিকাশে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদানের দায়িত্ব বহন করতে হবে আমাদেরই।

আমাদের এ-রকম সব দায়িত্বচেতনা ও কর্তব্যনিষ্ঠার মধ্য দিয়েই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসটি তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে।

# একুশে ফেব্রুয়ারি

কামাল চৌধুরী*

অন্ধকার পায়ে ছিল। অবশেষে হামাগুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়েছে।
ওরা এল বলে তাকালাম। আমাকে যে চক্ষু দিলে তাতে
এই অসুস্থ বালক শয্যা ছেড়ে বাইরে এসেছে
পায়ের তলায় ভোর, পথ দীর্ঘ– তবু আলোকিত।

ফাল্গুনের রক্তঝাউ পরে আছে বসন্তের জামা
আমি তার এক হাতা পরে অন্য অংশ দিয়েছি ভাইকে
ভাই বোনকে দিয়েছে তার সবগুলো সবুজ বোতাম
আর সুতো
আমরা সবাই মিলে ভাগ করে পেয়ে গেছি একটি পতাকা।

*কবি: প্রধানমন্ত্রীর প্রাক্তন মুখ্যসচিব

# মাতৃভাষা নিয়ে লড়াই

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম*

মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই ভাষা-সংখ্যালঘুদেরই করতে হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রে আমরা, অর্থাৎ বাঙালিরা সংখ্যাগুরু ছিলাম পরিসংখ্যানের বিচারে, ক্ষমতার বিচারে সংখ্যালঘু। সে জন্য ভাষা নিয়ে আমাদের সংগ্রাম করতে হয়েছিল। বাংলাদেশে বাঙালিরা সব অর্থেই গরিষ্ঠ, এখন মাতৃভাষা নিয়ে লড়াই করতে হচ্ছে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোকে। এর মধ্যে তাদের কিছু ভাষা হারিয়ে গেছে। বাকিগুলো থাকবে কি না, তা নির্ভর করছে রাষ্ট্রীয় সমর্থন, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতা এবং মাতৃভাষার প্রতি এই জাতিগোষ্ঠীগুলোর অঙ্গীকারের ওপর। আমরা আশা করব, এই ভাষার মাসে বিপন্ন মাতৃভাষাগুলোর প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার কথাটা আমরা মনে রাখব।

মাতৃভাষা নিয়ে এখন বাঙালিদের লড়াইয়ের চরিত্রটা পাল্টে গেছে। একটা সময় ছিল—স্বাধীনতার কিছুকাল পর পর্যন্তও যখন বাঙালি মাত্রই ধরেই নিত, স্বাধীন বাংলাদেশে মাতৃভাষা হবে শিক্ষার মাধ্যম; এই ভাষায় সরকারি, বেসরকারি, বিচারিক সব কাজ করা হবে। এমনকি ব্যবসা-বাণিজ্যও বাংলাকে প্রধান মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করবে। স্বাধীনতার পর ৪৭ বছর চলে গেল—এখনো শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার ব্যবহার সর্বজনীন নয়, উচ্চ আদালতের কাজকর্ম চলে ইংরেজিতে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাষা, তথাকথিত করপোরেট ভাষা শুরু থেকেই ইংরেজি। সরকারি দপ্তরে বাংলার ব্যবহার আছে এবং সেটি প্রশংসনীয়, কিন্তু যথাযথ পরিভাষার অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই ইংরেজির আবশ্যকতা থেকেই গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় কেন শিক্ষা দেওয়া হয় না, সেই প্রশ্ন তুললে বলা হয়, তাহলে বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমরা কোনোদিনই পেরে উঠব না। ভালো কথা, ইংরেজিতে পড়াশোনা করে আমরা বিশ্বকে হারাব, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব রাস্তায় হেঁটে আমরা মণিমাণিক্য কুড়াব। কিন্তু তা তো আর হয়নি। প্রকৃত অবস্থাটা হলো, আমরা ইংরেজিতে অতিশয় দুর্বল। যদি বুঝতাম ইংরেজিটা তেমন না শিখতে পারলেও বাংলা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, তাহলেও হতো। কিন্তু এখানেও বাস্তবতা ভিন্ন। মাতৃভাষায় নির্ভুলভাবে লেখা ও বলার ক্ষেত্রে আমাদের সামর্থ্য হতাশাজনক।

মাতৃভাষা নিয়ে আমাদের লড়াইটা এখন আর এর অধিকার প্রতিষ্ঠাতেই সীমাবদ্ধ নয়।

*শিক্ষাবিদ ও কথাসাহিত্যিক

লড়াইটা এর যথাযথ শিখন, ব্যবহার ও চর্চা এবং এর বিকাশ নিয়েও। বাংলা এখন ভয়ানক মিশ্র একটি ভাষা। সব ভাষাই কমবেশি মিশ্র ভাষা, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ভাষার অনেক রূপের মধ্যে একটি থাকে যা ব্যবহৃত হয় এর সৃজনশীল ও মননশীল কল্পনা প্রকাশে। এই ভাষাটি সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন সাধনা ও উন্নত চিন্তার প্রকাশের মাধ্যম। এর বাইরে আঞ্চলিক ভাষা থাকে, কথ্য ভাষা থাকে, খিস্তি-খেউড়ের এবং চৌরাস্তার ভাষা থাকে।

গণমাধ্যমও ভাষা তৈরি করে। তাতে তো সমস্যা নেই। কিন্তু যদি একটার সঙ্গে আরেকটা লেপ্টে যায়, জট বেঁধে যায় জ্ঞান প্রকাশের ভাষার সঙ্গে চৌরাস্তার ভাষার, তাহলে তো বিপদ। বিপদ আসে ভাষার ছয় আনা ইংরেজি শব্দের দখলে চলে গেলে। অনেকে অবশ্য এসবকে বিপদ মানতে রাজি নন। বলেন, এটিই স্বাভাবিক। যদি স্বাভাবিকই হয়ে থাকে, তাহলে এই দায়টা শুধু বাংলার কেন? এই 'স্বাভাবিক'-এর প্রকাশ ইংরেজি বা স্প্যানিশ ভাষায় দেখি না কেন? চৈনিক ভাষায় এই স্বাভাবিকতা নেই কেন? ইংরেজি ভাষাটা আমাদের শিখতে হবে, যেহেতু বৈশ্বিক বাস্তবতা এটি শেখার পক্ষে। কিন্তু বাংলার জায়গাটা যেন ইংরেজির হাতে আমরা ছেড়ে না দিই; এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ যা, বাংলার বিশেষণ ও ক্রিয়াপদকেও যেন ইংরেজির হাতে তুলে না দিই। একই কথা খাটে আরবি, স্প্যানিশ বা ফরাসি ভাষার ক্ষেত্রে।

আমি একটি ভাষায় অন্য একটি ভাষার অনেক শব্দ অনিবার্যভাবে ঢুকে পড়াকে স্বাভাবিক বলি এবং এগুলো জোর করে বের করার প্রচেষ্টাকে অস্বাভাবিক বলি। একসময় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিতজনেরা বাংলা থেকে আরবি-ফারসি শব্দ বের করে দিয়েছিলেন। এতে বাংলা দুর্বল হয়েছিল। বাংলায় প্রতিবছরই নতুন বিদেশি শব্দ ঢুকবে কিন্তু সেগুলো হবে মূলত বিশেষ্য শব্দ এবং এতে বাংলা ভাষার মূল কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, অথবা প্রচলিত বাংলা শব্দকে এগুলো বিদায় করে দেবে না। আমি যাকে স্বাভাবিক বলতে রাজি নই, তা ভাষা নিয়ে অরাজকতা। একটি নির্ভুল বাক্য বলতে বা লিখতে না পারা, অকারণে ইংরেজি শব্দের দ্বারস্থ হওয়া, ইচ্ছা করেই ভাষাকে বিকৃত করা—এসব আমাকে হতাশ করে। আমি বিশ্বাস করি, কোনো ভাষা ব্যবহারকারীর ভাষায় যদি একটা নান্দনিক শৃঙ্খলা না থাকে, তার চিন্তাতেও শৃঙ্খলা আসবে না। একজন টিভি প্রতিবেদক যখন একটি সামান্য বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে 'কিন্তু' এবং 'আসলে'-র আক্রমণে তার বাংলাকে দুর্বল করে ফেলেন, দেখা যায় দুই মিনিটেও তিনি মূল কথাটিই বলতে পারছেন না। এ রকম কেন হবে?

ভাষার মাসে আমি ভাষার সব রূপের বিকাশ চাই। স্বাস্থ্যবান মাতৃভাষা চাই, যা পরনির্ভর এবং অসুখপ্রবণ নয়, যার ভেতরের গানটা সুর-তাল হারাবে না।

ভাষার মাস শুরু হয় বইমেলার দ্বারোদ্‌ঘাটন দিয়ে। আমাদের দেশে একসময় বই পড়ার একটা সংস্কৃতি ছিল। দৃশ্যমাধ্যমের প্রাবল্যে তা দুর্বল হয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে, তা যেন ফিরে আসছে। বইমেলা বই পড়ার চর্চা বাড়ায়। এখন সারা দেশে সারা বছর বইমেলা

হয়। অনেকে বলেন, প্রতিবছর ছাপানো বইয়ের সংখ্যা বাড়ছে বটে, কিন্তু মান কি বাড়ছে? আমি বলি, বই যে ছাপা হচ্ছে, এ বিষয়টাকেই আমরা প্রথম উদ্‌যাপন করব। একটি বইয়ের মান আছে কি নেই, তা ঠিক করবেন পাঠক। পাঠকের হাতে এই দায় ছেড়ে দেওয়া যায়।

ভাষা ব্যবহারের প্রথম তালিমটি একটি সন্তান পায় তার মা, বাবা অথবা পরিবারের অন্য কারও থেকে। তারপর স্কুলে। এই দুই জায়গাতেই এখন একটি অভাব দেখা দিয়েছে। পরিবারের ক্ষেত্রে অভাবটা সময়ের অথবা ইচ্ছার অথবা সামর্থ্যের, স্কুলের ক্ষেত্রে সুযোগের। এখন যে পরীক্ষাপ্রবণ, মুখস্থপ্রধান শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়েছে, তাতে একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে সৃজনশীল ভাষা ব্যবহারের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়েছে। এখন মুখস্থ চর্চাই নিয়ম। শিক্ষকেরা এই নিয়মের বাইরে যেতে চান না।

যে শিক্ষাব্যবস্থা কল্পনাশক্তিকে জাগায় না, মনের দরজা-জানালাগুলো খুলে দেয় না, শিক্ষার্থীর ভেতর তার চারপাশ ও বিশ্বকে নিয়ে কৌতূহল জাগায় না, সেই শিক্ষাব্যবস্থায় ভাষাচর্চাও হবে ধরা-বাঁধা। সেটি সবল এবং সৃজনশীল হবে, তেমন ভাবার কারণ নেই।

ভাষার মাসে শিক্ষা নিয়েও লড়াই করার একটা অঙ্গীকার আমাদের করতে হবে।

# মুজিবের নামে শপথ

কাবেদুল ইসলাম

পিতা, কে বলে তোমার মৃত্যু হয়েছে, তুমি সন্তানহারা?
তোমার স্পর্শে মৃত্যুপুরীতে জাগে জীবনের সাড়া।
আকাশে-বাতাসে আজও বেজে ওঠে বজ্র কণ্ঠস্বর
ভগ্ন, হতাশ হৃদয় যে হয় প্রত্যয়ে ভাস্বর।
রক্ত আকরে লেখা পোস্টারে কতো যে দেয়ালে তুমি!
তোমার ভাষণ উজ্জীবনের আনে হাওয়া মৌসুমি।
তোমার উঁচানো তর্জনী দেখে শোষকের বুক কাঁপে
মার্চ-আগস্টে, ডিসেম্বরে দেশ জ্বলে উত্তাপে।
অন্ধ যারা দেখে না তারা কী বীজ গিয়েছো বুনে!
ঘরে ঘরে কোটি জন্ম নিয়েছে 'মুজিব', তোমারই খুনে।

তাই তো তোমার খুনকে করে শত্রুরা এতো ভয়
নিহত মুজিব শাশ্বত, অমর, অব্যয়, অক্ষয়।
ফি-বছর ঘুরে আগস্ট আসে বাংলায় যতোবার
চেতনা আমাদের করে শানিত দুর্জয়, দুর্বার।
দেখে তাই আজ তোমার ছেলেদের রণ-প্রস্তুতি, পণ
থরথর্ কাঁপে ঘাতকের দল, ওঁৎ-পাতা দুশমন।

আজকে তোমার অমর নামে নিচ্ছি শপথ ঢের
আসে যদি কোনো রক্তরঞ্জিত ভয়াল রজনী ফের
দামাল ছেলেরা বুক পেতে দেবে, বানাবে ব্যূহ-প্রাকার,
দাঁড়াবে তাদের সম্মুখে কে? বুকে পাটা আছে কার?

ঘাতক, দালাল, দুর্বৃত্ত যতো, হোক না দলেতে ভার
এবার তাদের রচবেই কবর, করবে বাংলা ছাড়।

*কবি ও গবেষক; পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

# প্রিয়তম বাংলা ভাষা চিরজীবী হোক

মোনায়েম সরকার*

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই ভাষার জন্য আমরা রক্ত দিয়েছি। রাজপথে বলি দিয়েছি অনেক তাজা প্রাণ। বুকের রক্ত এত বেশি ঢেলে পৃথিবীর আর কোনো দেশ আমাদের মতো মাতৃভাষাকে রক্ষা করতে পারেনি। ভাষা আন্দোলনের লড়াই আমাদের বাঁচতে শিখিয়েছে। এই লড়াইয়েরই চূড়ান্ত ফসল আমাদের বহুল আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা মূলত বাংলা ভাষা রক্ষার আন্দোলনের সোনালি ফসল। বাংলার কবি অতুলপ্রসাদ সেন বলেছিলেন: 'মোদের গরব মোদের আশা/ আ মরি বাংলা ভাষা'। বাংলা ভাষা যে বাঙালির গৌরব বৃদ্ধি করে চলেছে, তার প্রমাণ ইতঃপূর্বে আমরা বহুবার পেয়েছি। সম্প্রতিও পেলাম বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃতির মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বাংলা ভাষার গৌরবকে আরো মর্যাদাপূর্ণ করেছে। বাংলা ভাষাভাষী হিসেবে আমরা সম্মানিত।

বাংলা ভাষা এক সহস্রাব্দ অতিক্রম করে আরেকটি নতুন সহস্রাব্দের দিকে যাত্রা শুরু করেছে। শুরু থেকেই বাংলা ভাষার যাত্রাপথ নানা সংকটে আকীর্ণ ছিল– এখনও বাংলা ভাষার আকাশ থেকে সংকটের কালো মেঘ পুরোপুরি সরে যায়নি। প্রতিনিয়তই বাংলা ভাষা নানামুখি চক্রান্তের মুখোমুখি হচ্ছে। সেসব চক্রান্ত ছিন্ন করে বাংলা ভাষা এগিয়ে যাচ্ছে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে। পৃথিবীতে যত ভাষা আছে সেসব ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষাই সবচেয়ে সংগ্রামী আর প্রতিবাদী। যতবার বাংলা ভাষার উপর আক্রমণ এসেছে ততবারই বাঙালিরা সেসব আক্রমণ প্রতিহত করে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। এখনও বাংলা ভাষা তার আত্মমর্যাদা রক্ষার্থে অবিরাম লড়াই করে যাচ্ছে। যতদিন না বাঙালিজাতি বাংলা ভাষাকে মনে-প্রাণে ধারণ করবে, ততদিন বাংলা ভাষাকে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে যেতেই হবে। আত্মপ্রতিষ্ঠার এই অবিরাম লড়াই থেকে যেদিন বাংলা ভাষা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে সরে দাঁড়াবে সেদিনই তার পতন অনিবার্য হয়ে উঠবে। তবে আশার কথা হলো বাংলা ভাষা মৃত্যুঞ্জয়ী। এ ভাষার কোনো লয় নেই, ক্ষয় নেই, ধ্বংস নেই। মাঝে মাঝে ভিনদেশি রাক্ষুসে ভাষা এসে বাংলা ভাষাকে গ্রাস করতে চায় বটে কিন্তু বাংলা ভাষা এমনই এক মৃত্যুহীন ভাষা যে একে কিছু সময়ের জন্য বন্দি করা যায় কিন্তু চিরতরে ধ্বংস করা যায় না। অবিনশ্বর বাঙালি জাতিসত্তার মতো বাংলা

*রাজনীতিক, প্রাবন্ধিক ও গবেষক

ভাষাও অমর, অজর, অক্ষয়।

মোগল আমলে ফারসি যখন রাজভাষা হিসেবে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বাংলাভাষা তার নিজস্ব ভূখণ্ডেই কোণঠাসা হয়ে পড়ে। রাজার অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য এবং সুযোগ-সুবিধা নেওয়ার জন্য এই ভূখণ্ডেরই একদল লোক ফারসি ভাষার চর্চা করতে উঠে-পড়ে লাগে। আরেকটি দল থেকে যায় দরিদ্র বাংলা ভাষার কাছে। মরতে মরতে বেঁচে যায় বাংলা ভাষা। মোগলদের পরে ইংরেজরা এলে বাংলা ভাষার উপর শুরু হয় নতুন অত্যাচার। তখনও বাংলা ভাষার বন্ধনকে উপেক্ষা করে, ভুলে গিয়ে বাংলা ভাষার মহিমা একদল সুবিধাভোগী ইংরেজি ভাষাকে সাদরে গ্রহণ করে। তারা হয়ে ওঠে কালো সাহেব। তাদের ভাবখানা এমন যেন বাংলা তাদের বৈমাত্রেয় বোন। তারা এড়িয়ে চলতে থাকে বাংলা ভাষার সংস্পর্শ। বাংলাকে তারা শুধু অনাদর আর অবহেলা করেই ক্ষান্ত হলেন না, তারা বাংলাকে 'ল্যাংগুয়েজ অব ফিশারম্যান' বলতে শুরু করেন। এদের মধ্যে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)-ও ছিলেন। কিন্তু যখন তাঁর মোহ ভঙ্গ হয় তখন তিনি ঠিকই এসে মুখ লুকান বাংলা ভাষার আঁচলে। বঙ্কিমচন্দ্রও প্রথম প্রথম ইংরেজি-ভাষা চর্চা শুরু করেছিলেন। কিন্তু তিনিও অবশেষে আশ্রয় নিয়েছেন বাংলার কুঁড়েঘরে।

বাংলা ভূখণ্ড যখন ব্রিটিশমুক্ত হলো তখন আশায় বুক বাঁধে বাংলা ভাষা। এ ভাষা ভাবতে শুরু করে তার দুঃখের রাত বুঝি শেষ হয়ে গেল। কিন্তু না, নতুন করে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় উর্দু নামের এক অদ্ভুত ভাষা। উর্দু বাংলার বিরুদ্ধে এমনই ষড়যন্ত্র শুরু করে যে, বাংলার তখন নাভিশ্বাস উঠে যায়। ফারসি, ইংরেজি ভাষার উৎপাত বাঙালিরা মেনে নিলেও উর্দুর বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। বলতে গেলে উর্দুর হাত থেকে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করার আন্দোলনই বাঙালির প্রথম ভাষা রক্ষা বিষয়ক আন্দোলন। এর আগে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করার জন্য কোনো সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। উর্দুর বিরুদ্ধে চার বছর বাঙালি রক্তঝরা ভাষা আন্দোলন করে। ১৯৪৮ সালে যে আন্দোলন শুরু হয় তার সমাপ্তি ঘটে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে। এর মাঝে ঘটে যায় অনেক ঘটনা। অনেক প্রাণ বিসর্জিত হয় রাজপথে। জেল-জুলুম-নির্যাতন সহ্য করেন অনেক ভাষা সৈনিক। অসংখ্য মানুষের প্রাণদান আর নির্যাতনের বিনিময়ে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি পায় বাংলা ভাষা। ১৯৫২ সালের সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত, যে মুহূর্তে বাংলা ভূখণ্ডে বাংলা ভাষা প্রথম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি পায়।

বাংলা সাহিত্যের এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত একমাত্র প্রাচীন গ্রন্থ 'চর্যাপদ'। চর্যাপদের ভাষা বাংলা বলেই স্বীকৃত। চর্যার ভাষা দিয়ে বাংলা ভাষার বয়স যদি হিসাব করা হয়, তাহলে দেখব, যে যুগে চর্যাপদ রচিত হয়েছে সে-যুগে অভিজাত কেউ বাংলা ভাষার চর্চা করেননি। চর্যাপদ যারা রচনা করেছিলেন তারা প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন পলাতক মানুষ। তারা স্থির হয়ে কেউই বাংলা ভাষাচর্চা করার সুযোগ পাননি। যদি পেতেন তাহলে শুধু একখানা গ্রন্থ রচনা করেই তারা ক্ষান্ত হতেন না, তাদের হাত দিয়ে আমরা আরো অসংখ্য গ্রন্থ পেতাম। তাছাড়া চর্যাপদ আবিষ্কারের মধ্যেও আছে চমৎকার বিস্ময়। বাংলা ভাষার গ্রন্থ বাংলা

ভূখণ্ডে পাওয়া গেল না, পাওয়া গেল ভিনদেশ নেপালে। কেন বাংলা ভাষার গ্রন্থ নেপালে আবিষ্কৃত হলো– এ সম্পর্কেও নতুন করে গবেষণা হওয়া দরকার।

মধ্যযুগের কবি আবদুল হাকিম তাঁর *নূরনামা* গ্রন্থে বলেছিলেন:

"যে সব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সেসব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।"

কেন আবদুল হাকিম এ কথা বলেছিলেন তা আজ অনেকেরই জানা। কেননা তখনও একদল বাংলা-ভাষাবিদ্বেষী মানুষ ছিলেন যারা বাংলা ভাষাকে মোটেই সুনজরে দেখতেন না। বাংলা ভূখণ্ডে এক শ্রেণির মানুষ বাস করে যারা এদেশের খায়, এদেশের পরে কিন্তু স্বপ্ন দেখে ইরান, তুরান, ইউরোপের, পাকিস্তানের। এরা পরগাছার মতো। এদের ভাষাপ্রেম তো নেই-ই, দেশপ্রেমও নেই। দেশপ্রেম আর ভাষাপ্রেম পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যার দেশপ্রেম থাকে তার ভাষাপ্রেমও থাকে। যার দেশপ্রেম থাকে না, তার ভাষাপ্রেমও লোপ পায়।

যুগে যুগে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে যে কত রকম ষড়যন্ত্র হয়েছে তার দুই-একটি নমুনা তুলে ধরতে চাই। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে *রওশন হেদায়েত* নামে একটি পত্রিকা তার 'লেখক-লেখিকাগণের প্রতি' নিবেদন করে বলে– "হিন্দুয়ানী বাঙালি না হইয়া দোভাষী অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষা প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। অ-ইসলামিক শব্দ যেরূপ স্বর্গ, নরক, যুগ, ত্রিভুবন, ঈশ্বর, ভগবান, নিরঞ্জন, বিধাতা ইত্যাদি প্রবন্ধে থাকিলে, সে প্রবন্ধ বাহির হইবে না। লেখকগণের খেয়াল করা দরকার, বোজর্গানে দীন যখন এদেশে ইসলাম প্রচার করিয়াছিলেন তখন তাঁহারা এদেশের ভাষার মধ্যে ইসলামিক ভাষা প্রবেশ করাইয়া সর্বসাধারণকে ইসলাম শিক্ষা দিয়াছিলেন। 'রওশন হেদায়েতে'রও প্রধান উদ্দেশ্য ইসলাম শিক্ষা দেওয়া; কাজেই কালামে কুফর প্রকাশ হওয়া উচিত নয়।" অর্থাৎ যারা মনে করে আরবি, ফারসি, উর্দু ছাড়া অন্য ভাষা গ্রহণ করলেই বাংলা ভাষার চরিত্র নষ্ট হয় তারা প্রকারান্তরে বাংলা ভাষার শত্রুই। পৃথিবীতে হাতেগোনা কয়েকটি ভাষা ছাড়া সব ভাষার মধ্যেই প্রচুর কৃতঋণ শব্দ রয়েছে। বাংলা ভাষার মধ্যেও প্রচুর কৃতঋণ শব্দ ঢুকে পড়েছে কিংবা বলা যায়– নিজের প্রয়োজনেই বাংলা ভাষা বিদেশি শব্দ ঋণ নিয়েছে।

অধ্যাপক যতীন সরকার তাঁর একটি প্রবন্ধে "বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক নিয়ে হিন্দু-মুসলমানি কাণ্ড" বলেছেন: 'বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা না উর্দু?'– এই অদ্ভুত প্রশ্নটি তো উনিশ শতকেই উঠেছিল। সে সময়েই তো নবাব আবদুল লতিফ মুসলমানের মাতৃভাষা যে উর্দু সে বিষয়ে স্থির নিশ্চিত ছিলেন। তবে, নিম্নশ্রেণির যেসব মুসলমান উর্দুকে ঠিক মতো রপ্ত করে উঠতে পারেনি, তাদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য তিনি 'মুসলমানি বাংলা'র সুপারিশ করেছিলেন। সেই মুসলমানি বাংলা হবে প্রচলিত বাংলা থেকে

আলাদা, সংস্কৃতের বদলে এতে থাকবে সেইসব আরবি-ফারসি শব্দ যেগুলো উর্দু ভাষায় বহু ব্যবহৃত। নবাব আবদুল লতিফরা হয়তো বিশ্বাস করতেন যে এরকম মুসলমানি বাংলার পথ ধরে হাঁটতে-হাঁটতে 'আতরাফ' মুসলমানরা এক সময় উর্দুর মঞ্জিলে পৌঁছে 'আশরাফ'দের কাতারে শামিল হয়ে যেতে পারবে।"

নবাব আবদুল লতিফদের মতো এরকম আরও অনেক স্বার্থান্বেষীর অসংখ্য ষড়যন্ত্র ও নীলনকশা একদিন বাংলা ভাষাকে ঘিরে ধরে ছিল। দুর্মর বাংলা ভাষা সেসব অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে আজ গৌরবের মর্যাদায় আসীন। এখানে অবশ্য একটি কথা না বললেই নয় যে, বাংলা ভাষাই এশিয়া মহাদেশে প্রথম ভাষা যে ভাষার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার ঘোষিত হওয়ার মাত্র তেরো বছরের মাথায় এই দুর্লভ পুরস্কারে ভূষিত হন।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা করার জন্য যে লড়াই শুরু হয়েছিল ও রক্ত ঝরেছিল, ১৯৯৯ সালে তা মর্যাদা পায় 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'-এর। সারা পৃথিবীর মানুষ আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে জানতে ও বুঝতে শিখছে। এটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটা খবর। যে ভাষাকে একদিন গলাটিপে হত্যা করার চক্রান্ত হয়েছিল সেই ভাষার সম্মানার্থেই আজ পালিত হচ্ছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'। এর চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার আর কী হতে পারে? তবু দুশ্চিন্তার ব্যাপার হচ্ছে, এখনও বাংলা ভাষা সর্বস্তরে সমানভাবে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া ক্রীতদাসেরা এখনও বাংলার বদলে ইংরেজি আওড়াতে বেশি সম্মানিত বোধ করে। প্রতিক্রিয়াশীল, মৌলবাদীরা এখনও স্বপ্ন দেখে এদেশে আবার ফিরে আসবে আরবি, ফারসি, উর্দু মিশেল খিচুড়ি ভাষা, বাংলা-বিদ্বেষী এই কুলাঙ্গারেরা শুধু বাংলা ভাষারই শত্রু নয়, এরা বাংলাদেশেরও শত্রু। এদের যথাযথভাবে প্রতিহত করতে হলে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন করা এখন সময়ের দাবি। যদিও এই দাবি অনেক আগে থেকেই উঠেছে।

বর্তমান সরকার বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশ বান্ধব সরকার। বঙ্গবন্ধুর হাতেই নির্মিত হয়েছিল বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উপাখ্যান। বাংলা ভাষার বৈশ্বিক মর্যাদাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনার হাতে। যদি আমরা সত্যি সত্যিই বাংলা ভাষাকে দেশের মাটিতে এবং বিদেশিদের কাছে মূল্যবান করে তুলতে চাই, তাহলে এখনই সুযোগ সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন ঘটানো– কেননা এমন সুযোগ অতীতে কখনো আসেনি। ভবিষ্যতেও আসবে কি-না সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। বাংলা ভাষা দীর্ঘজীবী হোক, আত্মমর্যাদায় বলীয়ান হোক আমাদের প্রিয় বাংলা ভাষা।

# একুশের আলোকে প্রবাদ-বচন আর বাঙালি রীতি

মোহাম্মদ জমির*

আমজনতার ব্যবহার করা ছোট ছোট সারগর্ভ কথাকে বলে প্রবাদ, বচন। উৎপত্তির দিক দিয়ে বেশির ভাগের অবস্থান ধর্মীয় আর জাতির ইতিহাস-মঞ্চে লোকগাথা ও লোকগীতির সমান্তরাল। মাঝেমধ্যে উপকথা আর ধাঁধার সঙ্গেও জড়ানো হয়ে থাকে এগুলোকে। প্রবচন, চুটকি কিংবা জনশ্রুতি নামে সাহিত্যেও অবাধ বিচরণ এগুলোর।

পৃথিবীর প্রতি প্রান্তের প্রতিটি অঞ্চলের বাসিন্দাদের ভাষার অন্যতম অনুষঙ্গ বচন ও প্রবাদ। স্থানীয় সাংস্কৃতিক আবহ, ভাষা আর স্থানীয় ভাবপ্রকাশের পার্থক্যকে ফুটিয়ে তুলতে এগুলোর জুড়ি নেই। স্বভাবের কিছু অংশের নিয়ন্ত্রণে এগুলোর ভূমিকা রয়েছে। আদিবাসী প্রজ্ঞা আর আচারবিধির দৃষ্টান্ত হিসেবেও এগুলোর ব্যবহার কম নয়। আবার একই বচনের বহু রকম ব্যবহার দেখা যায়। বাংলা বচনের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই। বাংলা ভূখণ্ডে ব্যবহার হওয়া বচনগুলোর সমার্থক জনশ্রুতি খুঁজে পাওয়া যায় ওড়িশা, আসাম, বিহার, তামিলনাড়ু এমনকি নেপালের ভাষা আর উপভাষাগুলোতেও। এসব বচন শুধু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, আবহাওয়া আর ভাগ্যগণনাকেই তুলে ধরে তা নয়, এগুলোর ব্যবহার হয় সামাজিক আচরণের বিভিন্ন পর্যায়েও।

ইউরোপ আর বাংলার প্রবাদ-প্রবচনগুলোর মধ্যে সাধারণ মিল হলো, এগুলো সবই ঘরোয়া দৃশ্যপট তুলে ধরে। কারণ এগুলোর অধিকাংশেরই উৎপত্তি পল্লিসমাজ থেকে। ইউরোপে প্রবাদ-প্রবচনে উঠে আসে পাত্র-কেটলি, ভেড়া, ঘোড়া, মোরগ-মুরগি, গরু, কুকুর আর দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ঘটনা। বাংলা প্রবাদে ঘুরে-ফিরে আসে গৃহপালিত পশু আর দৈনন্দিন জীবনকে ঘিরে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। আর এর সবই শহুরে জীবনের পরিবর্তে গ্রামকেই বেশি তুলে ধরে।

ইউরোপীয় প্রবাদের সঙ্গে বাংলার সবচেয়ে বড় অমিল ঐতিহাসিক ঘটনা ব্যবহারের ক্ষেত্র। উনিশ শতকে এসে অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি বাংলা বচন সংগ্রহ করে সেগুলো ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সহযোগে প্রকাশ করার প্রয়াস নিয়েছেন। কিন্তু লিপিবদ্ধ সূত্রের অভাব থাকায় সেগুলো নিয়ে কার্যকর তেমন কিছু অর্জন করা সম্ভব হয়নি। সে-কারণেই এখন পর্যন্ত কিছু কিছু বচনের উৎপত্তি সাল কিংবা লেখকের পরিচয় নিয়ে রয়েছে বিতর্ক। আবার

*সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সুশাসন বিষয়ক বিশ্লেষক

পুরানোগুলোকে উপজীব্য করে লেখা নতুন বচন এ বিতর্ককে বরং জটিলই করে তুলেছে।

যাই হোক, সব প্রবাদ-বচনের মূল বৈশিষ্ট্য একটাই। প্রতিটিরই রয়েছে দার্শনিক বিষয়াদি আর বিশেষ অর্থ। আবেগ নয়, দীর্ঘ অভিজ্ঞতাই তীক্ষ্ণতর আর সংক্ষিপ্ত রূপে তুলে ধরা হয় এসব বচনে। এজন্যই কিছু বাঙালি ভাষাবিদ বচনকে বলেছেন, মানব অভিজ্ঞতার স্ফটিকায়িত রূপ।

বাংলা বচন প্রায়ই দ্ব্যর্থবোধক– একটি সাহিত্যিক, আরেকটি অন্তর্নিহিত। সাধারণত বচনের গুরুত্ব এর প্রতীকী অর্থের ওপর নির্ভরশীল। আর সে-কারণেই রূপকাশ্রয়ী শ্রুতিগুলো প্রবাদ হিসেবে শনাক্ত করা সহজ। বাগ্‌ধারার সঙ্গে এগুলোর মূল পার্থক্য এখানেই। এদিক থেকে দেখলে বচনগুলো একেকটি আলাদা অস্তিত্ব বলতে হবে, যেগুলো পোড়খাওয়া অভিজ্ঞতারই খণ্ডাংশ। বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক ফ্রান্সিস বেকন বচনের এ বৈশিষ্ট্য দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর মতে, একটি জাতির প্রতিভা, রস আর চেতনা ফুটে ওঠে তাদের প্রবাদে।

বাংলা প্রবাদ-বচনগুলো বর্ণনামূলক। তাতে থাকে একটি সুনির্দিষ্ট বিষয় এবং সংশ্লিষ্ট মন্তব্য। সাধারণ বোধ-বুদ্ধিভিত্তিক এ শ্রুতিগুলো গ্রামবাংলায় টিকে রয়েছে কয়েকশ' বছর ধরে; হয়ে উঠেছে নৈতিকতার অলিখিত মানদণ্ড। একটি অঞ্চলের মূল্যবোধ শুধু নয়, সেখানকার সাংস্কৃতিক পরিচয়ও একাধিক উপায়ে তুলে ধরে বচনগুলো। একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার, বছরের পর বছর ধরে বিবর্তিত হয়েছে বাংলা বচন। এ প্রেক্ষাপটে সুশীলকুমারদে-র সঙ্গে একমত হয়ে বলতে পারি যে, গাঁয়ের লোকদের মুখে মুখে এগুলো তৈরি হলেও অধিকাংশ সময় এগুলোর উৎস নির্দিষ্ট করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে।

বাংলা বচনগুলোর রয়েছে নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু ও অর্থ। এদের মধ্যে কিছুর গঠন অসঙ্গতিপূর্ণ; আবার অন্যগুলো তুলনামূলক কিংবা পূরক ধরনের। কিছু প্রবাদ-বচন রয়েছে যেগুলো আলোচনা করে সমাজবিজ্ঞানের নীতি, রাজনীতি কিংবা অর্থনীতি নিয়ে। আবার কিছু বচন রয়েছে আবহাওয়া, আবহাওয়ার ধরন, অতিপ্রাকৃতিক বিষয়বস্তু, গাছগাছালি বা জীবজন্তু নিয়ে। দৈনন্দিন ভাগ্যগণনার মতো বিষয়ও স্থান পেয়েছে বচনের আলোচ্যসূচিতে।

১৯৭৬ ও ১৯৮৫ সালে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয় মোহাম্মদ হানিফ পাঠানের *বাংলা প্রবাদ পরিচিতি* বইটি। এখানে উত্থাপিত একটি প্রসঙ্গ বিশেষভাবে তুলে ধরতেই হয়, বাস্তবতার নিরিখে প্রবাদ সংগ্রহ ও তা প্রকাশের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন হানিফ মোহাম্মদ। তিনিই প্রথম যথার্থভাবে তুলে ধরেছেন মুখে মুখে বচনের ছড়িয়ে পড়ার গুরুত্ব। এজন্য বচন পেয়েছে নিজস্ব একটি গতি আর দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগক্ষমতা। আবার এ বচনই পারে সামষ্টিক অভিজ্ঞতাকে একসূত্রে বেঁধে পরিভাষা এবং বাগ্‌ধারার বিবর্তন ত্বরান্বিত করতে। আমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের মতো একটি জাতির প্রতিভা আর চেতনাকে বুঝতে হলে প্রবাদের বিকল্প নেই বলা চলে। সমাজবিদ্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এ উপাদানের গুরুত্ব আরও বড় হয়ে দেখা দেয়, যখন এ ধরনের বচন ধর্মীয় রীতির মতোই পল্লি অঞ্চলের নৈতিক মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়।

বচনের ইতিহাস আর প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা খনার নাম উল্লেখ না করলে। এ দেশের প্রথাগত কৃষি মানদণ্ডের অনেকটাই গড়ে উঠেছে খনার বচনের ওপর নির্ভর করে। জনস্বাস্থ্য নিয়ে একরকম প্রায় অব্যর্থ পরামর্শ রয়েছে তাঁর বচনগুলোয়। বহু শতক ধরে বচনগুলো এদেশের সভ্যতা আর সংস্কৃতি গড়ে তোলায় রেখেছে বিশেষ অবদান। এমনকি সভ্যতা আর সংস্কৃতির ভাঙা-গড়াতেও পরোক্ষভাবে কাজ করে গেছে বচনগুলো।

খনার বচনের সিংহভাগই ধান, কলা আর বিভিন্ন সব্জিচাষের পদ্ধতি ও উপকারিতা নিয়ে। পান, নারিকেল, তুলাসহ দৈনন্দিন জীবনের আরো বহু কিছুই স্থান পেয়েছে এসব বচনে। কিছু সময় এসব বচন ঘোরতর দার্শনিক। খনার ছন্দ আর প্রকরণে স্পষ্ট প্রভাব পড়েছে মধ্যযুগীয় বাংলা ব্যাকরণের বিশেষ একটি সময়ের। আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, খনার বচনের সঙ্গে মিল রয়েছে প্রায় একই সময়কার উড়িয়া, কানাড়া, তেলুগু আর নেপালি ভাষার প্রবাদগুলোর।

বাংলা ভূখণ্ডের ভাষা হিসেবে বাংলা আর বচনের মধ্যে রয়েছে অতি পুরানো সম্পর্ক। ইতিহাস থেকে অবশ্য জানার উপায় নেই যে, ঠিক কবে থেকে এ ভূখণ্ডের বাসিন্দারা পেশা হিসেবে চাষাবাদকে বেছে নিয়েছে। অবশ্য অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন, খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দের কাছাকাছি কোনো এক সময় হবে সেটি। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ আর বীরভূমে বিভিন্ন সময় খননকাজ চালিয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে, এখানে গড়ে ওঠা সভ্যতার মানুষ বহু আগে থেকেই কৃষিজ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিল (*দি ইস্টার্ন অ্যানথ্রোপলজিস্ট*, খণ্ড ৩১, নং ৪, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা ৫৪৩-৫৫৫)। চব্বিশ পরগনার চন্দ্রকেতুগড়ে মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে কৃষিসংশ্লিষ্ট কিছু টেরাকোটা। এগুলোয় ফুটে উঠেছে নারকেল, সুপারি ও তালগাছের মতো অতিপরিচিত দৃশ্য নিয়ে। এ ধরনের তথ্যপ্রমাণ এটাই নির্দেশ করে যে, অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল কৃষির সঙ্গে। আবার এ সম্পর্কই ফুটে উঠেছে বিবর্তমান বাংলা প্রবচনে।

বাংলার প্রাথমিক দিককার অর্থনৈতিক ইতিহাস ঘাঁটলে বোঝা যায়, একসময় কৃষিকাজ আর এর সংশ্লিষ্ট পেশাকে খুবই সম্মানের সঙ্গে দেখা হতো। বাংলার অর্থনীতিতে কৃষকের অবদানের বিষয়টি উঠে এসেছে খনার বচনে। মধ্যযুগের বিশিষ্ট কবি মুকুন্দরামের কবিতাগুলোয়, বিশেষ করে চণ্ডীমঙ্গলে উঠে এসেছে কৃষকের মাহাত্ম্য। একাধিকবার খনা বলেন:

যার ঘরে নেই ঢেঁকি মশাল
সেই বৌঝির নেই কুশল

কিংবা

গরু, জরু, ধান
এই তিনে রাখে মান

কিংবা

যার গোলায় নাই ধান
তার আবার কোঠার টান

কিংবা

যার নাই গরু
সে সবার হরু

এসব বচনে স্বাস্থ্যবান গৃহপালিত পশু এবং কৃষি উপকরণের গুরুত্বের ওপরই বারবার আলোকপাত করেছেন খনা। কারণ এগুলো গৃহস্থের ধনসম্পদ বলে বিবেচিত।

নিকট অতীতে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় জরিপ চালিয়ে এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, ডাক কিংবা খনার কথা না জানলেও তাদের বচনগুলো প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জীবনের অংশ হয়ে গেছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। বিশেষ করে ময়মনসিংহ (ত্রিশাল থানা), কুমিল্লা (ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা) এবং দিনাজপুরে (সেতাবগঞ্জ উপজেলা) মাত্র ৯ শতাংশ লোক ডাক কিংবা খনার লেখা পড়েছেন। আবার ৯৩ শতাংশ ব্যক্তিই খনা এবং কৃষির মধ্যকার সম্পর্কটা জানেন। এটা দেখা গেছে, বাংলাদেশের ৮৯ শতাংশ মানুষই গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয়গুলোয় খনার বচন গুরুত্বের সঙ্গেই বিবেচনা করে থাকেন।

একুশের এই দিনে বচন নিয়ে লিখলাম। কারণ আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে প্রবাদ-বচনের অবদান কিংবা প্রভাব অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

# শুধু একটি 'অথবা'

রশীদ হায়দার*

দাবি করে বলছিনে, শুধু অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই বলা। অনুমানের পক্ষে অবশ্য কিছু কার্যকারণ আছে। সেই কার্যকারণ ব্যাখ্যা করার জন্যে বেশি গভীরে যাবার প্রয়োজন নেই, সামান্য একটু মনোনিবেশ করলেই দেখা যাবে 'অথবা' বলে একটি শব্দ পাকিস্তানকে মাত্র সাড়ে তেইশ বছরের মধ্যেই ভেঙে দু'টুকরো করে দিলো, মোহাম্মদ আলী জিন্নার 'পাকিস্তান হ্যাজ কাম টু স্টে' গর্বিত উক্তিটি ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে বাংলার গাঢ় সবুজের পটভূমিতে টকটকে লাল সূর্য অঙ্কিত পতাকা বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে ছাড়লো। বিশ্ববাসী জানলো, দেখলো এই 'অলস, অকর্মণ্য, ভেতো বাঙালি' মাত্র নয় মাসে কী অসাধ্য সাধন করে একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো। ১৯৭১ সালে দুই পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেলে সারা পৃথিবীতেই একটা আতঙ্কের ঝড় বয়ে যায়– তাহলে 'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ' কি আসন্ন?

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরই শুরু হয়নি? দেখা যাচ্ছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু পরেই ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হয়েছে, ভারত-চীন যুদ্ধ, কোরিয়ান যুদ্ধ, ইসরাইল-আরব যুদ্ধ, যে-যুদ্ধে ইসরাইল বনাম মিশর-জর্দান-সিরিয়া তিন দেশ মিলে ইসরাইলকে হারাতে তো পারলোই না, উল্টো নিজেদের অনেক জায়গা-জমি খুইয়েছে, সর্বশেষ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইসরাইলকে খুশি করতে জেরুজালেমকেই ইসরাইলের রাজধানী ঘোষণা দিয়ে ছাড়লো। এরও আগে আমরা দেখেছি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, ভিয়েতনাম-আমেরিকা লড়াই। সবই রক্তক্ষয়ী, প্রাণবিনাশী, সহায়-সম্পদের ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি। অর্থাৎ একদিকে রক্তগঙ্গা, অপরদিকে শান্তি-শান্তি চিৎকারের লোক দেখানো খেলা। দুটোই চলছে। হয়তো এভাবেই চলবে।

১৯৭১ সালের যুদ্ধটা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিলো পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী। তাদের মোটাবুদ্ধির ধারণায় যুদ্ধের মতো ভয়াবহ শক্তি প্রয়োগ করলেই বাঙালি ঠান্ডা হয়ে যাবে। ১৯৪৭ সালে, দেশভাগের পর অনেকগুলো ঘটনা স্রেফ শক্তি প্রয়োগ করে, ধোঁকা দিয়ে, মিথ্যে আশ্বাস প্রদান করে, জেল-জুলুম-অত্যাচার চালিয়ে আপাতত থামিয়ে দিয়ে ভেবেছিলো ১৯৭১ সালের মার্চের প্রচণ্ড আক্রমণই হবে বাঙালির জন্যে উচিত শিক্ষা। 'পূর্ব পাকিস্তানের

*কথাসাহিত্যিক ও মননশীল প্রবন্ধকার

মানুষ নয়, শুধু মাটি চাই'; এই বিশ্বাসে তারা যে পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করে– তার ফলাফল হচ্ছে কপাল পুড়লো, মুখ পুড়লো তাদের, আমাদের নয়। আমরা কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ করলাম। অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে পাকিস্তানি সৈন্যরা নিজেদের পায়ের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করে পরাজয় মেনে নেয়। তখন জয় হয় এই নিরস্ত্র বাঙালির, যারা শুদ্ধ অর্থে একরকম খালি হাতেই তো শক্তিশালী ও সামরিক শক্তিতে বলীয়ান পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিলো। বঙ্গবন্ধুর অবিস্মরণীয় আহ্বানের মধ্যে একটি 'যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।'– নির্দেশটি হাতে হাতেই প্রমাণ করে ছাড়লো বাঙালি।

প্রশ্নটি হচ্ছে– কীভাবে তা সম্ভব হয়? এই রচনার শিরোনামেই আমি 'অথবা' শব্দটি ব্যবহার করেছি। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের মৃত্যুঘণ্টা বেজে ওঠে ঐ ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখেই। করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম সভাতেই। বিষয়টি প্রমাণ করার জন্যে কিছু দৃষ্টান্ত প্রদান করা আবশ্যিক। বলে নেয়া ভালো, প্রথমেই কিন্তু রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন ছিলো না। পার্লামেন্টে পাকিস্তানের সমস্ত সদস্যের উপস্থিতিতে আলোচনাটি কোন্ ভাষায় হবে– সে সম্পর্কেই ২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রস্তাবটি নেয়া হয়। আলোচনার জন্যে তারিখ নির্দিষ্ট হয় ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮।

'পাকিস্তান গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের আনীত সংশোধনী প্রস্তাব এবং সে সম্পর্কিত বিতর্ক' থেকে আমরা যে তথ্যাদি পাচ্ছি, তা থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, একরোখা এবং পূর্ব সিদ্ধান্ত থেকে একচুল নড়া চলবে না-সিদ্ধান্তেই অটল থাকার সংকল্প করেছিলো মুসলিম লীগ সরকার। দুর্ভাগ্যজনক সত্য হলো, বাঙালি মুসলিম লীগ সদস্যরাও সেদিন সুর মিলিয়েছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানিদের সঙ্গে, উর্দুর পক্ষে। এই দুষ্টকর্মের অন্যতম নেতা ছিলেন বাঙালি শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে পূর্ববঙ্গের নেতা তমিজ উদ্দীন খান, নূরুল আমীন প্রমুখ ক্ষমতাসীন মুসলমান ভাইদের মন রক্ষার্থে ও ছিটেফোঁটা দান-খয়রাত পেতে সমর্থন জানান উর্দুকে। এই সমর্থনকে মোটেই সমর্থন জানাতে পারেননি কংগ্রেস দলীয় নেতা, কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি শহীদ হন ১৯৭১ সালের কোন্ তারিখে সেটা নির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও ২৯ মার্চ যে ধর্মসাগর পাড়ের বাড়ি থেকে তাঁর কনিষ্ঠপুত্র দিলীপ দত্তসহ তাঁকে পাকিস্তানি মিলিটারিরা তুলে নিয়ে যায়, সেটা আজ সর্বজনবিদিত ইতিহাস।

ধীরেন দত্তের অপরাধটা কী? তিনি কি ১৯৭১ সালের গোড়ায় জনগণের সঙ্গে রাজপথে মিছিল করেছেন, নাকি স্লোগান দিয়েছেন, নাকি প্রকাশ্য জনসভায় পাকিস্তানের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন? না, তিনি তা করেননি। তিনি যা করার তা করাচিতে তো করেই দিয়েছেন ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ সালে। তখন থেকেই তো তাঁর সেই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয় ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে, ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের ইসলামিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নে, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনে, ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে এবং ১৯৬৮-৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে।

ভাষার প্রশ্নে পাকিস্তান সরকারের আরো দু'বার মূঢ়তার প্রমাণ মেলে। ১৯৫২ সালের 'ফেব্রুয়ারি' ঘটে গেলে ১৯৫৬ সালে যে শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হয় সেখানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা স্বীকার করলেও বলা হয় এটা কার্যকর হবে ২০ বছর পর। একই কথার পুনরাবৃত্তি ঘটে ১৯৬২ সালে, সেনাশাসক জেনারেল আইয়ুবের রচিত শাসনতন্ত্রে। ১৯৫৬ সাল বলি বা ১৯৬২, ২০ বছর পরে কার্যকর হবে ধরে নিলে তা হয় ১৯৭৬ বা ১৯৮২। এখানেই রবীন্দ্রনাথের শরণ নিই। তিনি বলেছিলেন:

রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহা ধূমধাম
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে আমি দেব রথ ভাবে আমি
মূর্তি ভাবে আমি দেব হাসে অন্তর্যামী।
('ভক্তিভাজন'; কণিকা)

চিত্রটি স্পষ্ট। ২০ বছর পর হলে যে-দুটো সালের কথা উল্লিখিত হয়েছে, সেই দুটি সালই বাংলাদেশের অধিকারে, বাঙালির ব্যবহারে ও সাধারণ জনগণের নিত্য আনুষ্ঠানিকতায়। আসলে বাঙালিকে নির্বোধ ভেবে, সান্ত্বনা দিয়ে, আশার বাণী শুনিয়ে আরো সময় নেবার অর্থ স্পষ্ট– এই দুই দশকে উর্দুকে বাংলাদেশের আরও তৃণমূলে নিয়ে যাওয়া যাবে। একটা পুরো প্রজন্মই বাংলা ভাষা-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে: একটা বিশাল দূরত্ব সৃষ্টি হবে। ফলস্বরূপ, বাংলার লোকের কাছে এটা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গৃহীত হবে। হয়তো ভাষাটাই চিরকালের মতো হারিয়ে যাবে অথবা পঙ্গু হয়ে পড়বে।

এর মধ্যেই আরো কয়েকটি ঘটনা ঘটে যা স্পষ্টই প্রমাণ করে পশ্চিম পাকিস্তান কিছুতেই চায় না পূর্বপাকিস্তান পাকিস্তানের মূল ক্ষমতায় আসুক। তারা সচেতনভাবেই আঘাত করে আমাদের সংস্কৃতির প্রধান অভিভাবক রবীন্দ্রনাথকে। তারা ১৯৬৭ সালের ২২ জুন তারিখে ঘোষণা দেয় 'রেডিও পাকিস্তানে রবীন্দ্রসংগীত সম্প্রচার নিষিদ্ধ'। পাকিস্তানি শাসকরা উপলব্ধিই করতে পারেনি তারা বাঙালির কোন্ অনুভূতিতে আঘাত হেনেছে। তীব্র প্রতিবাদ, সাংস্কৃতিক আন্দোলন, মিছিল, মিটিং হলো। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে কিছু তথাকথিত বাঙালি কবি-সাহিত্যিক এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বিবৃতি দেন। তাদের সংখ্যা ছিল ৪০। এর মধ্যেই বাঙালির আরেকটি রসবোধের প্রমাণ মেলে। যে ৪০ জন রবীন্দ্রবিরোধী বক্তব্য দেন, তারা সবাই 'আলিবাবার ৪০ চোর'-এর দলভুক্ত হয়ে যান।

উদাহরণ আরও দেওয়া যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে মর্মান্তিক হচ্ছে, ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে যে ভয়াবহ ও প্রলয়ঙ্করী জলোচ্ছ্বাস বয়ে যায় তাতে মৃত্যু হয় ১০-১২ লক্ষ লোকের। হাজার হাজার গবাদিপশু মারা যায়। ক্ষতি হয় কোটি কোটি টাকার সহায়-সম্পদের। সে সময় ত্রাণ প্রদান করা এত জরুরি হয়ে পড়ে যে, প্রয়োজন হয় হেলিকপ্টারের। তখন পূর্বপাকিস্তানে ত্রাণকার্য চালানোর মতো হেলিকপ্টার ছিল না। সে সময়, ২৩ নভেম্বর প্রকাশ পেলো কেন্দ্রীয় সরকারের সবচেয়ে অমানবিক আচরণটির কথা।

পূর্বপাকিস্তানের গভর্নর অ্যাডমিরাল আহসান প্রকাশ করলেন 'ত্রাণকার্যের জন্য তিনি হেলিকপ্টার চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু হেলিকপ্টার আসেনি।'

এই সময়েই ইয়াহিয়া খান ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের একটি চূড়ান্ত বেলেল্লাপনার ঘটনাও ঘটে। এটি লিখেছেন বাংলাদেশ বিমানের ক্যাপ্টেন আলমগীর সাত্তার। তখন তিনি পিআইএ-র একটি ছোট বিমান চালাতেন। পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে সামুদ্রিক দুর্যোগের বেশ পরে ইয়াহিয়া খান দুর্গত অঞ্চল পরিদর্শন করতে যান। প্লেনে রয়েছে আরো কিছু পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তা। প্রেসিডেন্টের সফরসঙ্গী, আলমগীরের ভাষ্য অনুসারে– বিমানে ইয়াহিয়া খানের স্বাভাবিক অবস্থায় হেঁটে ওঠার শক্তি ছিল না বলে ধরে তোলা হয়। বিধ্বস্ত এলাকার ওপর দিয়ে বিমান উড়ে যাচ্ছে। ক্যাপ্টেন সাত্তার ও তার অবাঙালি কো-পাইলট ককপিট থেকে দেখতে পাচ্ছেন হাজারে হাজার মানুষের মৃতদেহ, গরু-মহিষ, গাছের ডালে ঝুলছে মৃত মানুষ। কিন্তু চোখে পড়ছে না কোনো জীবন্ত মানুষ কিংবা চলাচলরত গবাদিপশু। অপরদিকে বিমানের ভিআইপি আসনগুলো থেকে আসছে হাসি, উল্লাস। দেখতে পাচ্ছেন, বিমানবালাদের মদের বোতল নিয়ে ছুটোছুটি এবং আরো চোখে পড়ছে তাদের আলুথালু শাড়ি ও ব্লাউস। আকাশে বিমান চলার সময় মহামান্য প্রেসিডেন্ট ও তার সফরসঙ্গীরা কী দেখতে ও করতে ব্যস্ত ছিলেন, তা বুঝতে মোটেও কষ্ট হয়নি ক্যাপ্টেন সাত্তারদের। কথাদেরও চলার মতো পা ও ওড়ার মতো পাখা আছে তা বোধ করি খেয়ালই ছিল না ইয়াহিয়াদের। রাতারাতিই জানাজানি হয়ে গেল সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস কবলিত এলাকায় পাকিস্তানি শাসকরা কেমন প্রমোদভ্রমণ করে দুর্গত এলাকা দেখেছে।

১৯৭০ সালের ২৮ নভেম্বরেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়ে দিলেন 'ঘূর্ণিঝড়ে ১০ লাখ মারা গেছে। স্বাধিকার অর্জনের জন্যে আরো ১০ লাখ লোক প্রাণ দেবে।' কিন্তু ইতিহাস তো আগেই ইতিহাস লিখে রেখেছে। বঙ্গবন্ধুর উল্লিখিত সংখ্যার সঙ্গে আরো ৩ (তিন) গুণ, অর্থাৎ ৩০ লাখ বলতে হবে।

ইয়াহিয়া ও ভুট্টো পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলকে যে দেশ শাসন করতে দেবে না, তার স্পষ্ট ইঙ্গিতও ভুট্টো দিলেন ১৯৭০ সালের ২০ ডিসেম্বর ও ২১ ডিসেম্বর তারিখেই। ২০ ডিসেম্বরে ভুট্টোর বক্তব্য, 'পাঞ্জাব ও সিন্ধু পাকিস্তানের দুর্গবিশেষ। পাকিস্তান পিপলস্ পার্টিকে বাদ দিয়ে সংবিধান রচিত হতে পারে না, সরকারও গঠিত হতে পারে না।' আর ২১ ডিসেম্বর ভুট্টোর উক্তি: 'গত তেইশ বছর পূর্ব পাকিস্তান দেশ শাসনে ন্যায্য হিসাব পায়নি, তাই বলে আগামী তেইশ বছর পাকিস্তানের ওপর প্রভুত্ব করবে তা হতে পারে না।' এই দম্ভোক্তি যে এক বছরও টিকবে না তা অন্তর্যামী আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন।

১৯৭১ সালে ২৫ মার্চের রাতে নির্মম গণহত্যা শুরু হলে ভুট্টো-ইয়াহিয়া প্রকাশ্যে যতই গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলুক, তারা দফায় দফায় বৈঠক করে বাঙালিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলো। পাকিস্তান থেকে প্লেনভর্তি করে বেসামরিক পোশাকে সামরিক বাহিনীর লোকজন আনছিলো তা তো প্রমাণই হয়ে গেল ২৫ মার্চ রাতেই, আর মুজিব-ইয়াহিয়া-

ভুট্টো আলোচনা-বৈঠক যে আসলে পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট ও ভুট্টোর সময় ক্ষেপণ ও যুদ্ধ প্রস্তুতি, সেটাও দিবালোকের মতোই স্পষ্ট ও প্রমাণিত হয়ে যায়।

১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদে যখন ভাষা ব্যবহারের প্রশ্ন উঠলো তখন কি কেউ ভাবতে পেরেছিলেন যে এই 'নির্দোষ' ও সাধারণ প্রশ্ন শুধু বিষয় হিসেবে না থেকে জাতীয় রাষ্ট্রভাষার প্রধান অস্ত্রে পরিণত হবে? লেখার শিরোনামে যে 'অথবা' ব্যবহার করেছি সেই শব্দটিই যে ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছিলো তা কালে কালে ধ্রুব সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। উপরিউক্ত তারিখে পাকিস্তানের মৃত্যুঘণ্টা যে বেজে ওঠে তা শুনেছিল ইতিহাস, সময় ও মহাকাল। কী বললেন শ্রী দত্ত? বললেন, "Mr. President, Sir, I move: That in sub-rule (1) of the rule 29, after the word 'English' in the line 2, the words 'or Bengalee' be inserted." নির্দোষ সংশোধনী or প্রস্তাব, আর তাতেই তীব্র প্রতিবাদী হয়ে উঠলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান। তিনি বললেন, তাঁর বন্ধু শ্রী দত্তের বোঝা উচিত যে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছে লক্ষ লক্ষ মুসলমানের দাবির পটভূমিতে এবং সেই লাখ লাখ মানুষ হচ্ছেন মুসলিম। যাদের মুখের ভাষা হচ্ছে উর্দু। লিয়াকত আলী খান আরো যোগ করেন, "আমার সম্মানিত বন্ধু ইংরেজির জায়গায় উর্দু আসুক শুনে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু তাঁর জানা উচিত পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ মানুষ উর্দুতে কথা বলেন, শুধু তাই নয়, দেশের দুই অংশের মানুষের মধ্যে ভাষার মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষার একটি মাত্র ভাষাই ব্যবহৃত হতে পারে, আর সেটি হচ্ছে উর্দু। আমার বিবেচনায় উর্দুই রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত।" লিয়াকত আলী খান এভাবে বক্তব্য শেষ করেন: পূর্বাঞ্চলের ও পশ্চিমাঞ্চলের জনগণের মধ্যে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার প্রধান অবলম্বনই হচ্ছে উর্দু। আর সে জন্যেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হওয়া প্রয়োজন। তিনি তাঁর ভাষণে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে 'ভারতীয় চর', 'বিচ্ছিন্নতাবাদী', 'কমুনিস্ট' ইত্যাদি পরিচয় অভিহিত করতে দ্বিধা করেননি।

সম্মানিত পাঠককে বিষয়টি অনুধাবন করতে অনুরোধ করি। 'সামান্য' একটি সংশোধনী 'অথবা' বিষয়টি কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গেল। সত্যের শক্তিটা এখানেই নিহিত যে প্রয়োজনে সেটি ঠিক সময়ে ঠিকই মাথা চাঁড়া দিয়ে ওঠে, মাটি ফুঁড়ে বেরোয়।

লিয়াকত আলীর কথার সূত্র ধরে আরো বলা যায়, তিনি বারবারই বলতে চাইছেন পাকিস্তান মুসলমানের দেশ, যেহেতু মুসলিমপ্রধান সেজন্যে তার ভাষাটাও 'মুসলমানী ভাষা' অর্থাৎ 'আরবির মতো' হওয়া উচিত। জানি, মধ্যপ্রাচ্যে সর্বাধিক ব্যবহৃত ভাষা আরবি, এই ভাষার ওপর ভিত্তি করেই মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকাতে রয়েছে অনেকগুলো দেশ। কিন্তু ভাষা এক বা কাছাকাছি হলেও এক দেশ আরেক দেশ এক হয়ে যেতে পারে না। প্রতিটি দেশের রয়েছে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য, পৃথক আচার অনুষ্ঠানের রীতি-নীতি- পোশাকে, খাদ্যাভাসে, সংস্কৃতিতে। এখানে সংস্কৃতির ভূমিকাই প্রধান। ভাষা-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অঙ্গ ও বাহন। দেশবিশেষে সংস্কৃতিই চিনিয়ে দেয় এটা কোন্ দেশের পরিচয় বহন করছে। ধর্ম

সেই পরিচয়ের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক হতে পারে না। স্প্যানিশ ও পর্তুগিজ ভাষা দক্ষিণ আমেরিকার বহু দেশের শাসন ক্ষমতা দখল করলেও শত শত বছরেও অনেক দেশের সাংস্কৃতিক ক্ষমতা পুরোপুরি গ্রাস করতে ব্যর্থ হয়েছে।

পাকিস্তানিরা কি কখনও ভেবেছিলো দেশভাগের মাত্র ছয় মাস দশ দিনের মাথায় (১৪ আগস্ট ১৯৪৭- ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮) অখণ্ড পাকিস্তানের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে: দিনে-দিনে হুমকি-হুঙ্কার হয়ে উচ্চারণ করবে– ১২ শত মাইল দূরে বসে দ্যাখো, কেমন বীরের জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে তোমাদের চাইতে আমরা এগিয়ে যাই এবং যাচ্ছি।

# মহান একুশে ফেব্রুয়ারির সামাজিক গুরুত্ব

খ. ম. রেজাউল করিম*

## ১. ভূমিকা

প্রত্যেক মানুষের কাছে তার মাতৃভাষা সর্বাধিক প্রিয়। কারণ এ ভাষাতেই মানুষ তার চেতনাকে লালন করে। আশা-নিরাশা, আনন্দ-বেদনায় হৃদয়ের গভীরে জাগ্রত ভাবনা ও অনুভূতিগুলো প্রকাশ করে। এ-মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙালিজাতি আন্দোলন করেছে এবং জীবন দিয়েছে, যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তবে মুখের ভাষার জন্য আন্দোলনের ইতিহাসে বাঙালিরা একক নয়, আরও দৃষ্টান্ত আছে। দ্বাদশ শতকে ইংল্যান্ডের ইংরেজিভাষী মানুষকে লাতিনের পরিবর্তে ইংরেজি ভাষায় ভাবতে, বলতে ও লিখতে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের আসাম রাজ্যের বরাক উপত্যকায় বিগত শতকের ষাট দশকের শুরুতে বাংলা ভাষার জন্য বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল রাজপথ।[১] তবে ব্যাপকতায় ও গণমানুষের সম্পৃক্ততায় বাঙালির ভাষা আন্দোলন ছিল বৃহৎ পরিসরের।[২] এ আন্দোলন বাঙালির আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে। একুশের বৈপ্লবিক চেতনার স্পর্শে বাঙালির সামাজিক জীবন যে অপরিমেয় সম্ভাবনায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে তা একান্তরের রক্তাক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে বর্তমান সময়েও বহমান। সঙ্গত কারণেই একবিংশ শতাব্দীতে এসে বাঙালির সামাজিক জীবনে একুশের অবদানকে নতুন করে মূল্যায়ন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। কারণ স্বাধীন বাংলাদেশ ও বাঙালিজাতির ইতিহাসে একুশে ফেব্রুয়ারি ও ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। এ কথা সত্য যে, সামাজিক গুরুত্বের পাশাপাশি একুশে ফেব্রুয়ারির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য রয়েছে এবং এ সমস্ত দিক নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনা ও বিশ্লেষণ থাকলেও একুশের সামাজিক তাৎপর্যের দিকটি অনেকখানি উপেক্ষিত। সঙ্গত কারণেই বর্তমান প্রবন্ধে মহান একুশের সামাজিক গুরুত্বের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

## ২. মাতৃভাষার গুরুত্ব

ভাষা একটি জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। এর সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতও বিদ্যমান। ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী গুস্তাভ লা বোঁ-র বক্তব্য হলো, 'ভাষার

*গবেষক ও প্রবন্ধকার

চেয়ে অধিক জটিল, যৌক্তিক এবং বিস্ময়কর আর কী হতে পারে? সবচেয়ে জ্ঞানী শিক্ষাবিদ এবং সবচেয়ে সম্মানিত বৈয়াকরণ হয়ত ভাষা ব্যবহারের বিধিসমূহ নির্দেশ করতে পারেন; কিন্তু তারা ভাষা তৈরি করতে অক্ষম' ।[৩] এ মন্তব্যে ভাষা বিকাশের স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী প্রক্রিয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যে প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করা বিশেষজ্ঞদের পক্ষেও সম্ভব নয়। মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহিম (আঃ) বলেছেন, 'জ্ঞানীদের উচিত তাঁদের ভাষা ও সাহিত্যের সংরক্ষণ করা।'[৪] আবার প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুন বলেন, 'প্রত্যেকেরই শিক্ষার মাধ্যম তার মাতৃভাষা হওয়া উচিত। অপর ভাষায় শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদান অসম্পূর্ণ শিক্ষারই নামান্তর।'[৫] মাতৃভাষার সপক্ষে এমন হাজারো উক্তি রয়েছে যা অন্যান্য ভাষার ওপর মাতৃভাষার গুরুত্ব সহজেই অনুধাবন করতে সহায়তা করে।

## ৩. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জাতীয় জীবনে এক গৌরবময় ও ঐতিহ্যবাহী দিন। বাঙালির জাতীয় জীবনের সকল চেতনার উৎস এ দিন। ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখা যায়, পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে পূর্ববাংলার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়। এ আন্দোলনের ভিত্তি ছিল ১৯৪০ সালের 'লাহোর প্রস্তাব'। এ প্রস্তাবে উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম-অধ্যুষিত এলাকাসমূহে একাধিক স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ছিল।[৬] প্রস্তাবটি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে ভাষা আন্দোলনের প্রয়োজনই হতো না। কিন্তু ১৯৪৬ সালের দিল্লি সম্মেলনে তদানীন্তন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে লাহোর প্রস্তাবকে আংশিক সংশোধন করে একাধিক রাষ্ট্র সৃষ্টির পরিবর্তে উভয় অঞ্চল মিলে একটি পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়। সে অনুসারে ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। এর মধ্যে ভারত রাষ্ট্রের গঠন বিশ্বের আর দশটি দেশের মতো হলেও ভৌগোলিকভাবে পাকিস্তানের গঠনটা ছিল ভিন্নধর্মী। দেশটির মানচিত্রের পূর্বাংশ (তদানীন্তন পূর্ববাংলা) ও পশ্চিমাংশ (তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তান) ছিল ১,৬০০ কিলোমিটার বিদেশি ভূখণ্ড (ভারত) দ্বারা বিচ্ছিন্ন। এই বিভক্তির ভিত্তি ছিল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর 'দ্বিজাতিতত্ত্ব নীতি', যা ভাষা ও সংস্কৃতির মতো মৌলিক বিষয়াবলিকে অবজ্ঞা করে। তবু এক ধর্মীয় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একটি সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধশালী করে তোলার উদ্দীপনা তদানীন্তন পূর্ববাংলার জনগণকে উদ্দীপ্ত করে।[৭]

নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ছিল বাংলা ভাষাভাষী। ১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৫৬·৪০ শতাংশ ছিল বাঙালি, যাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ছিল সম্পূর্ণ পৃথক।[৮] এছাড়া ভাষা হিসেবে বাংলা ছিল সমৃদ্ধতর। তাই নিজের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই পূর্বপাকিস্তানের জনগণ আশা করেছিল, পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা হবে বাংলা। কিন্তু দেশভাগের অব্যবহিত পর থেকেই পাকিস্তানের মাত্র ৩·২৭% ভাগ

জনগণের মাতৃভাষা উর্দুকে পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলে। এ অবস্থায় ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদের অধিবেশনে কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রাজকুমার চক্রবর্তী একটি সংশোধনী প্রস্তাবে ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও গণপরিষদের সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন, যা ভোটাভুটির মাধ্যমে অগ্রাহ্য হয়।[৯] ফলে ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়।[১০] এই 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' একই বছরের ১১ মার্চ পূর্ববাংলায় সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। উক্ত দিনে সচিবালয়ের বাইরে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে একত্র হওয়া ছাত্রদের উপর পুলিশের ব্যাপক লাঠিচার্জে কমপক্ষে ৫০ জন ছাত্র গুরুতর আহত হয়। এ প্রেক্ষাপটে পরের দিনগুলোতে আন্দোলন আরও জোরদার হয় এবং সাধারণ জনগণ এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত হতে থাকে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির সঙ্গে ১৫ মার্চ আলোচনায় বসতে বাধ্য হন এবং সে সভায় ৮ দফা চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু পূর্ববাংলার প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনে ভাষার বিষয়টি উপেক্ষা করা হলে ছাত্ররা ১৭ মার্চ প্রাদেশিক পরিষদের দিকে মিছিল সহকারে অগ্রসর হয়। যদিও পুলিশের লাঠিচার্জ ও বন্দুকের ফাঁকা গুলির মুখে সে মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তবে এ আন্দোলন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। তার আহ্বানে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯ মার্চ পূর্ববাংলা সফরে আসেন এবং ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হবে একমাত্র উর্দু।' এ ঘোষণার প্রেক্ষাপটে সভার কোনো কোনো অংশ থেকে মৃদু 'নো নো' ধ্বনি উচ্চারিত হয়। এর তিনদিন পর ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি মন্তব্য করেন বাঙালিরা তাদের প্রদেশের সরকারি ভাষারূপে যে কোনো ভাষা নির্বাচিত করতে পারে কিন্তু পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হবে অবশ্যই উর্দু। এতে উপস্থিত গ্রাজুয়েটবৃন্দের পক্ষ থেকে যেমন তাৎক্ষণিকভাবে জোরালো 'নো নো' ধ্বনি উচ্চারিত হয়, তেমনি গভর্নর জেনারেলের এই অবিবেচনাসুলভ মনোভাব পূর্ববাংলার বুদ্ধিজীবী মহলে ও সাধারণ মানুষের মনে ক্ষোভ, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি করে। ঐ দিনই রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধি দল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে উপস্থাপিত যুক্তি সহকারে স্মারকলিপি পেশ করে। তবে জিন্নাহর পূর্ববাংলা সফর ভাষা আন্দোলনকে খানিকটা হলেও স্তিমিত করে। ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বরে ভাষার প্রশ্নে নতুন বিতর্কের সূত্রপাত হয়। পাকিস্তান গণপরিষদের সাংবিধানিক মূলনীতি কমিটি যে অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন গণপরিষদে পেশ করে, তাতে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করা হয়। এই প্রতিবেদনের প্রতিবাদে ঢাকায় একটি সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়, যার উদ্যোগে ৪ ও ৫ নভেম্বর ঢাকায় জাতীয় মহাসম্মেলন ও ১২ নভেম্বর পূর্ববাংলায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। অবশেষে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী উক্ত প্রতিবেদন প্রত্যাহার করে নিলে ভাষার প্রশ্নটি চাপা পড়ে যায়। তবে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন যেন একেবারে নিঃশেষিত হয়ে না যায় সে উদ্দেশ্যে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু উৎসাহী ও সংগ্রামী ছাত্র ১৯৫০ সালে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন। এরপর ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে ভাষা আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত হয় যখন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন পূর্ববাংলা সফরে এসে এক জনসভায় ঘোষণা দেন, উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। তার এ উক্তির প্রতিবাদে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' ৩০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট ও সভা আহ্বান করে। সেই সভায় ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরে ছাত্র ধর্মঘট, বিক্ষোভ মিছিল ও ছাত্রসভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এছাড়া ভাষা আন্দোলনকে সর্বাত্মক করার উদ্দেশ্যে ৩১ জানুয়ারি বিকালে ঢাকার বার লাইব্রেরিতে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে এক সর্বদলীয় সভার মাধ্যমে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়।[১১] উক্ত পরিষদ ৪ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি সমর্থন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে ২১শে ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্বপাকিস্তানে হরতাল, বিক্ষোভ মিছিল ও সভার কর্মসূচি ঘোষণা করে। এ পরিষদের কর্মসূচির প্রতি প্রাদেশিক সরকার কঠোর মনোভাব গ্রহণ করে এবং ২০ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৩ টা থেকে ১ মাসের জন্য ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।[১২] এই ঘোষণায় ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং ১৪৪ ধারা ভেঙে রাস্তায় নামে। এ প্রেক্ষাপটে পুলিশের গুলিতে রফিকউদ্দিন আহমদ, শফিউর রহমান, আবুল বরকত, আবদুল জব্বার এবং আবদুস সালামসহ আরো কিছু ব্যক্তির মৃত্যু হয়।[১৩] মাতৃভাষার সম্মান ও অধিকার সমুন্নত রাখতে প্রাণ বিসর্জনকারী এসব ছাত্র-জনতাকে জাতি 'শহীদ' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ভাষা শহীদদের এ আত্মাহুতি একদিকে যেমন ছিল মর্মান্তিক, তেমনি ছিল গৌরবোজ্জ্বল। এর প্রতিক্রিয়ায় স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে যে জনরোষের সৃষ্টি হয় তার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। অবশেষে ১৯৫৬ সালে প্রণীত পাকিস্তান সংবিধানে বাংলা ভাষাকে উর্দুর পাশাপাশি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

## ৩. একুশের সামাজিক প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব

বাঙালি জীবন ও বাংলাদেশের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা রেনেসাঁর মতোই তাৎপর্যবহ ও সুদূরপ্রসারী। বায়ান্নর যে ভাষা আন্দোলন, তা ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা, দাসত্ব থেকে মুক্তির প্রয়াস এবং সে সময়কার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের হঠকারিতা থেকে মুক্তির জন্য অঙ্গুলি নির্দেশ করা। সামাজিক বঞ্চনা-বৈষম্য এ সময়ে পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষের মনে গভীরভাবে প্রোথিত হতে থাকে। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারিতে এসে এর চরম বিকাশ ঘটে।[১৪] একুশে ফেব্রুয়ারি সংক্রান্ত আলোচনায় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকটি সর্বাগ্রে বিবেচনায় এলেও এর সামাজিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম, যা নিচে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হলো–

১. মূলত ভাষা আন্দোলন পাকিস্তানের রাজনীতিতে কেবল সুদূরপ্রসারী প্রভাবই ফেলেনি, এর সঙ্গে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সাংবিধানিক প্রশ্নও জড়িয়ে পড়ে। যেমন– কেন্দ্রীয় গণপরিষদে পূর্ববাংলার জনসংখ্যা-আনুপাতিক

আসনসংখ্যা, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবি, কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসে বাঙালিদেরকে অধিক সংখ্যক নিয়োগ এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান ঘটানোর দাবি জানানো হয়। অর্থাৎ ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই পূর্ববাংলার জনগণ সর্বপ্রথম তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংবিধানিক অধিকারের বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে। পূর্ববাংলার জনগণ যে পশ্চিম পাকিস্তানিদের থেকে আলাদা এবং তাদের দাবি যে স্বতন্ত্র খাতে প্রবাহিত হতে পারে– এ শিক্ষা মূলত ভাষা আন্দোলন থেকে আহরিত হয়।

২. ভাষা আন্দোলনের প্রথমপর্যায়ে এটি ছিল একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন মাত্র। কালক্রমে তা একটি আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনে রূপ নেয়। এ সময়ে অনেক সমাজসচেতন ব্যক্তি, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, সংস্কৃতিকর্মী ও রাজনৈতিক দল এ আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে। ফলে পূর্ববাংলার মানুষের মধ্যে স্বাধীনতা ও স্বাধিকারের চিন্তা-চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটে। তাই দেখা যায়, পরবর্তী আন্দোলনসমূহে ভাষা আন্দোলনের এই প্রেরণা অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। ফলে ভাষা আন্দোলন এক ধরনের প্রাদেশিকতাবাদের জন্ম দেয়। এরপর যখনই পূর্ববাংলার স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো দাবি উচ্চারিত হয়েছে তখনই তা পূর্ববাংলাবাসীর সমর্থন অর্জন করেছে।

৩. ভাষা আন্দোলন এদেশের ছাত্র সমাজকে প্রচ্ছন্নভাবে রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। এ আন্দোলনের মাধ্যমেই পূর্ববাংলার ছাত্ররা প্রথম প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে তমদ্দুন মজলিশ,[১৫] পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ এবং 'ছাত্র ইউনিয়ন' পরবর্তী আন্দোলনসমূহে মূল চালিকা শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, ন্যায়-অন্যায়, দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ উচ্চারণ করে ছাত্রসমাজ। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধেও ছাত্রসমাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৪. ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ছাত্র-জনতা, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতি সকল পেশার মানুষ এক কাতারে এসে দাঁড়ায়। ফলে তাদের মধ্যে সামাজিক সংহতি বা ঐক্যের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সৃষ্টি হয় এবং এ আন্দোলনের ফলে পূর্ববাংলায় ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়। পরবর্তী বিভিন্ন আন্দোলনে এর পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা যায়।

৫. ভাষা আন্দোলনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এর সঙ্গে জড়িত নেতৃবৃন্দ ছিলেন অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রবর্তক ও সমর্থক। পার্লামেন্টের মধ্যে কংগ্রেস

দলীয় হিন্দু নেতৃবৃন্দ ভাষার দাবিতে কথা বলেন, আর রাজপথে ধর্মীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। ফলে সে সময়ে পূর্ববাংলায় নিঃসন্দেহে হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সামাজিক সম্প্রীতি অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পায়।

৬. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে পুরুষের পাশাপাশি যাবতীয় সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এবং ধর্মীয় অনুশাসন সত্ত্বেও এদেশের সচেতন, শিক্ষিত নারী সমাজ এগিয়ে আসে।[১৬] বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি স্কুল-কলেজের ছাত্রীরাও এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। এর ফলে ছাত্রীরা ঘর থেকে বাইরে বেরোবার সুযোগ লাভ করে। কারণ সে সময়ে মুক্তাঙ্গনে নারীদের পদচারণা ছিল সীমিত।[১৭] পরবর্তীকালে বিভিন্ন সভা-সমিতি, কনফারেন্স, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে নারীদের অংশগ্রহণের এক নতুন ধারা সৃষ্টি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে মেয়েরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে থাকে, যা দেশের সার্বিক উন্নয়নের পথে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

৭. ভাষা আন্দোলন পূর্ববাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রভাবশালী ভূমিকার সূচনা করে। অতীতে এ অঞ্চলে উচ্চ শ্রেণির মাধ্যমেই সকল রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালিত হতে দেখা যায়। ভাষা আন্দোলনই প্রথম পূর্ববাংলায় মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করে, যা পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রেও সহায়ক হয়।

৮. একুশে ফেব্রুয়ারিকে নিয়ে বাঙালি জাতির প্রাণের আবেগ উচ্ছ্বাসই তাকে আন্তর্জাতিক মর্যাদায় নিয়ে যায়। একুশের আন্তর্জাতিক মর্যাদার প্রথম দাবি উত্থাপিত হয় ১৯৯৭ সালে একুশের এক অনুষ্ঠানে ময়মনসিংহের গফরগাঁও থিয়েটারের পক্ষ থেকে। ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত একটি একুশে সংকলনে তারা এ দাবি পুনর্ব্যক্ত করে।[১৮] তবে এক্ষেত্রে কানাডার বহুভাষিক ও বহুজাতিক মাতৃভাষাপ্রেমিক দলের উদ্যোগই প্রাথমিক ফল বয়ে আনে। এ দলের সদস্য কানাডাপ্রবাসী বাঙালি রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের এক প্রস্তাব ইউনেস্কোতে পৌঁছে এবং পরবর্তীকালে ইউনেস্কোর চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। ফলস্বরূপ ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কোর ৩০তম সাধারণ সম্মেলনে কমিশন ২-এর অধিবেশনে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ঘটনাটি এখানে এ কারণে উল্লিখিত হয়েছে যে, কোনো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা নয়, বরং একুশের আন্তর্জাতিক মর্যাদার দাবি সর্বপ্রথম উত্থাপিত হয়েছে এদেশের নিতান্ত সাধারণ জনগণের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে যথাযথ স্থানে প্রস্তাবটি উত্থাপনও প্রথমে ব্যক্তিগত পর্যায়েই হয়েছে। এদিক থেকে বোঝা

যায় একুশের চেতনা এদেশের সমাজের কত গভীরে প্রবেশ করেছে।

৯. প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারিকে জাতীয় শহীদ দিবস এবং একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের মধ্যে ভাষার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়, যা তাদের একই সঙ্গে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

১০. বাঙালির ভাষা শহীদ দিবসটি ২০০০ সাল থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি পাওয়ায় এর তাৎপর্য বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশনে ২০১১ সাল থেকে প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করবে জাতিসংঘ এ সংক্রান্ত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়।[১৯] এ-কথা ঠিক, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যখন এ দিবসটি পালিত হয় তখন তারা তাদের মাতৃভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে, কিন্তু এটা করতে গিয়ে তারা বাংলাদেশ ও ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কেও কোনো-না-কোনোভাবে সচেতন হয়। এতে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও বাঙালি সংস্কৃতির স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়। তাছাড়া দিবসটি পালনের ক্ষেত্রে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে এক ধরনের উদ্দীপনা লক্ষ করা যায়, যা তাদের মধ্যে সামাজিক সংহতি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১১. একুশের মাসে আমাদের সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য ও ইতিহাসের যে তাগিদ আমরা অনুভব করি, তা জাতির প্রেরণার বড় শক্তি হিসেবে কাজ করে।

১২. ভাষা আন্দোলন আমাদের সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে এক বিশাল ভূমিকা রেখেছে প্রধানত এজন্য যে, আমাদের মুক্তির পথ নির্দেশ করেছে এই ভাষা আন্দোলন।[২০]

১৩. একুশে ফেব্রুয়ারি ছিল একটি পরিপূর্ণ রাজনৈতিক অভ্যুত্থান। এই অভ্যুত্থানের অগ্রবাহিনী ছিল ছাত্র ও যুব সমাজ। অর্থাৎ ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই এদেশের ছাত্র ও যুব সমাজ রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে সচেতন হয়, যা একটি জাতির জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

ভাষা আন্দোলনের অনুপ্রেরণা বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের মূলমন্ত্র। বাঙালিজাতি নিজের ভাষার মর্যাদার জন্য যুদ্ধ করেছে, প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। এভাবেই শহীদদের রক্তের ওপর গড়ে ওঠে শহীদ মিনার।[২১] ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে উন্মেষ ঘটেছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের, শুরু হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের। একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালিজাতি নিজেদের জন্য একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে।[২২] ভাষা আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলা ভাষার যথাযোগ্য মর্যাদা এবং স্থান নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

## ৪. উপসংহার

জাতীয় ভাষা শহীদ দিবস তথা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের কল্যাণে বাংলাভাষা আজ বিশ্বের দরবারে পরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। বিশ্বের প্রায় ৩০ কোটি মানুষ বাংলায় কথা বলে।[২৩] বাংলাদেশসহ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বিহার, ওড়িশা এবং মিয়ানমারের আরাকান জনগোষ্ঠীও বাংলা ভাষায় কথা বলে। ভারতের আসামে এবং সিঙ্গাপুরে বাংলাকে দ্বিতীয় সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।[২৪] বাংলাদেশ সংবিধানের প্রথম ভাগের ৪নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে বলা আছে 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা'। এছাড়া ১৯৮৭ সালে দেশে বাংলা ভাষা প্রচলন আইন হয়েছে।[২৫] কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখনো সর্বত্র বাংলাভাষা ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়নি। বিশেষ করে, নিম্ন আদালতে বাংলার ব্যবহার শুরু হলেও উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষার ব্যবহার না থাকায় সমাজের সাধারণ ও কম শিক্ষিত মানুষকে ভোগান্তিতে পড়তে হয়। তদুপরি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বিদেশি মিডিয়ার প্রভাবে বাড়ছে বাংলা ভাষার বিকৃতি। দেশীয় মিডিয়া অবশ্য এক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে, তবে তাও সর্বাংশে যথাযথ নয়। এক্ষেত্রে ইংরেজি হিন্দি মেশানো জগাখিচুড়ি বাংলা নয়, বরং শুদ্ধ ও প্রমিত বাংলার ব্যবহার আবশ্যক। বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাল মেলাতে বিদেশি ভাষা শেখা ও চর্চার প্রয়োজন রয়েছে ঠিকই, তবে তা কোনোভাবেই বাংলাকে বাদ দিয়ে নয়। এ-অবস্থায়, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাংলার বিস্তারে সুস্থ সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। সমাজের সচেতন ও অগ্রসর অংশকে এ বিষয়ে এগিয়ে আসতে হবে, কেননা পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সর্বোপরি জাতীয় দাবি হিসেবে সর্বস্তরে বাংলাভাষার প্রচলন নিজেদের স্বার্থেই অত্যন্ত জরুরি।

## ৫. টীকা ও সূত্রনির্দেশ

[১] ভারতের আসাম রাজ্যের শিলচর ও করিমগঞ্জের বাঙালিদেরও বিরাট আত্মবলিদান রয়েছে। ১৯৬১ সালে শিলচরে মাতৃভাষার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন ১১ জন এবং করিমগঞ্জে ১৯৭২ সালে ১ জন এবং ১৯৮৬ সালে ২ জন প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তামিলনাড়ুতে তামিল ভাষার জন্য রক্তপাত ঘটেছে। (রামেন্দু মজুমদার, 'একুশের চেতনা অসাম্প্রদায়িকতা', *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১৪)।

[২] সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, 'একুশের বীজ থেকে অঙ্কুরিত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ', *দৈনিক কালের কণ্ঠ* (ঢাকা), ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১১, পৃ. ১৫

[৩] সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, 'দক্ষিণ এশিয়ার ভাষার রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে একুশে ফেব্রুয়ারি', *দৈনিক সমকাল* (ঢাকা), ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮, পৃ. ৭

[৪] তরীকুর রহমান, 'ইসলামে মাতৃভাষার গুরুত্ব', *দৈনিক কালের কণ্ঠ* (ঢাকা), ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১১, পৃ. ৭

[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

[৬] মোবায়েদুর রহমান, 'এপারে ভাষা আন্দোলনে কৃতিত্বের দাবী: ওপারে বাংলা ভাষার বেহাল অবস্থা: ভাষা সৈনিকেরা নীরব কেন?' *দৈনিক ইত্তেফাক* (ঢাকা), ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃ. ৫

[৭] মোঃ নুরুল আবেদীন, 'এক ঐতিহাসিক উত্তরণ', *দৈনিক ইত্তেফাক* (ঢাকা), ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃ. ২

[৮] মোঃ মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (১৯৪৭-৭১), ঢাকা: সময় প্রকাশন, অক্টোবর ১৯৯৯, পৃ. ১২৩

[৯] হাসান হাফিজুর রহমান, (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*, ১ম খণ্ড, ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নভেম্বর ১৯৮২, পৃ. ৫৪-৫৮: হায়াৎ মামুদ, *অমর একুশে*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২১ ডিসেম্বর ১৯৮৫, পৃ. ৬

[১০] ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে খুলনা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। খুলনার দৌলতপুরে আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বাংলাকে পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলা হয়।

[১১] সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কর্মপরিষদের সদস্য সংখ্যা সে সময়ে ছিলেন মোট ১১ জন।

[১২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৮

[১৩] ২০০০ সালে ভাষা শহীদ হিসেবে পাঁচজন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বয়ান্নর ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ হয়েছিলেন বরকত, জব্বার ও রফিক। ভাষা শহীদদের মধ্যে কেবল সালামই মিছিলে থেকে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মারা যাননি। একুশে ফেব্রুয়ারি গুলিবর্ষণে আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৭ এপ্রিল মারা গিয়েছিলেন তিনি। আর শফিউর রহমান শহীদ হয়েছিলেন ২২ ফেব্রুয়ারি। ২২ ফেব্রুয়ারি প্রাণ হারানোর তালিকায় আরো দুটি নাম পাওয়া যায় অলিউল্লাহ ও আবদুল আউয়াল। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইটে ভাষাশহীদ হিসেবে এই দুজনের নাম-পরিচয় উল্লেখ আছে। এছাড়া সালাউদ্দীন নামেও একজন ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ হন বলে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ভাষা শহীদদের সংখ্যা সম্পর্কে ভাষাসংগ্রামী ও গবেষক আহমদ রফিক বলেন, ২১ ফেব্রুয়ারি সীমাবদ্ধ বৃত্তে গুলি চালনা সত্ত্বেও কমপক্ষে চারজন শহীদ হয়েছিলেন। এছাড়া অন্যদের সম্পর্কে কিছু বলা যাচ্ছে না। কিন্তু ২২ ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতার ব্যাপক গণবিক্ষোভের মুখে উহলরত পুলিশ, ইপিআর ও সেনাবাহিনী একাধিক স্থানে গুলি চালনার ফলে ঠিক কতজন শহীদ হয়েছিলেন বলা কঠিন। বিশেষ করে পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে যেখানে সুযোগ মতো লাশ তুলে নিতে দেখা গেছে, সেক্ষেত্রে শহীদদের প্রকৃত সংখ্যা কোনো দিন বলা সম্ভব হবে না। ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ প্রকাশিত ভাষা আন্দোলনের অন্যতম পত্রিকাও *সৈনিক*-এর প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল, শহীদ ছাত্রদের তাজা রক্তে রাজধানী ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে ছাত্রসমাবেশে নির্বিচারে পুলিশের গুলিবর্ষণ বৃহস্পতিবারেই ৭ জন নিহত : ৩ শতাধিক আহত। *দৈনিক আজাদ*-এ ওই সময়ে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে ২১-২২ ফেব্রুয়ারি গুলিতে ৯ ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছিল। বহু লাশ গুম করে ফেলা হয়েছিল। কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকার ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত একটি সংবাদ শিরোনাম ছিল, বৃহস্পতি ও শুক্রবার মোট ৯ জন নিহত এবং অন্য একটি সংবাদে ও পুলিশের গুলিতে গতকল্য ও অদ্য এ যাবৎ ৬ জন নিহত হন উল্লেখ করা হয়। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *একুশে ফেব্রুয়ারি* সংকলনে অন্তর্ভুক্ত কবির উদ্দিন আহমদ, একুশের ইতিহাস নিবন্ধে লিখেছেন, আটজনের মৃত্যুর কথা সন্দেহাতীতভাবে জানা যায়। এই সূত্র ধরে এম আর আখতার মুকুল ৮ জন ভাষাশহীদের একটি তালিকা তৈরি করেছেন। তালিকাটিতে ২১ ফেব্রুয়ারি রফিকউদ্দিন আহমদ,

আবুল বরকত, আবদুল জব্বার, আবদুস সালাম এবং ২২ ফেব্রুয়ারি শফিকুর রহমান, আব্দুল আউয়াল, অহিউল্লাহ ও অজ্ঞাত বালককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন, ২১ ফেব্রুয়ারি গুলিতে চারজন ঘটনাস্থলেই নিহত হলো। আহত হলো ৩০ জন। জানা যায়, ৬২ জনকে জেলে ঢোকানো হয়েছে। আরো শোনা যায়, পুলিশ কয়েকটি মৃতদেহ সরিয়ে ফেলেছে। একুশের অমর গানের রচয়িতা আব্দুল গাফফার চৌধুরী বলেন, পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি, মেডিক্যালের ব্যারাক ছাত্রাবাসের সামনেই ভাষা শহীদদের জন্য গায়েবানা জানাজার ব্যবস্থা করা হয়। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এ জানাজায় ইমামতি করেন। জানাজার পর শোক মিছিল বের হয়। এত বড় শোকমিছিল ঢাকা শহর আর কখনো প্রত্যক্ষ করেছে কিনা তা আমি জানি না।

[১৪] মুহম্মদ মাহবুব আলী, 'একুশে ফেব্রুয়ারির শিক্ষা ও অর্থনৈতিক মুক্তির চিন্তা,' *দৈনিক ইত্তেফাক* (ঢাকা), ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃ. ১১

[১৫] পূর্বপাকিস্তান মুসলীম ছাত্রলীগ ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রথমপর্বে তমদ্দুন মজলিশের ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভাষা আন্দোলনের দু'মাসের মধ্যেই পূর্ববাংলায় 'ছাত্র ইউনিয়ন' নামে একটি ছাত্রসংগঠন গড়ে ওঠে।

[১৬] শাওয়াল খান, 'নারী শিক্ষা আন্দোলন ও সমাজ বাস্তবতা', *দৈনিক ইত্তেফাক* (ঢাকা), ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ১২

[১৭] সীমিত পরিসরে থেকেও মেয়েরা সাধ্যমত ভাষা আন্দোলনের জন্য লড়েছে।

[১৮] মোহাম্মদ হান্নান, 'একুশে ফেব্রুয়ারি কেমন করে আন্তর্জাতিক দিবস হলো', *দৈনিক জনকণ্ঠ* (ঢাকা), ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ৪

[১৯] *দৈনিক প্রথম আলো* (ঢাকা), ২৩ অক্টোবর ২০১০, পৃ. ১

[২০] আনু মাহমুদ, *একুশ থেকে স্বাধীনতা*, ঢাকা: ঝিঙেফুল, ২০০৯, পৃ. ৭৩

[২১] আজিজুল পারভেজ, 'শহীদদের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণ হয়নি', *দৈনিক কালের কণ্ঠ* (ঢাকা), ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ১৩

[২২] রিজওয়ানুল ইসলাম, 'একুশের চেতনা ও মাতৃভাষার ব্যবহার', *দৈনিক প্রথম আলো* (ঢাকা), ২৯ ডিসেম্বর ২০১৭, পৃ. ৫

[২৩] সৈয়দ আবুল মকসুদ, 'মাতৃভাষা, রাষ্ট্রভাষা ও জাতিরাষ্ট্র', *দৈনিক প্রথম আলো* (ঢাকা), ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১০

[২৪] মোঃ আলী এরশাদ হোসেন আজাদ, 'ভাষা ও ভালবাসার ফেব্রুয়ারি', *দৈনিক কালের কণ্ঠ* (ঢাকা), ১০ জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১৫

[২৫] এই আইন প্রবর্তনের পর বাংলাদেশের সর্বত্র তথা সরকারি অফিস-আদালত, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যতীত অন্য সবক্ষেত্রে নথি ও চিঠিপত্র, আইন-আদালত সওয়াল-জবাব ও আইনানুগ কার্যাবলি অবশ্যই বাংলায় লিখতে হবে। উল্লিখিত কোনো কর্মস্থলে যদি কোনো ব্যক্তি বাংলা ভাষা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় আবেদন বা আপিল করেন, তাহলে তা বেআইনি বা অকার্যকর বলে গণ্য হবে।

# English Articles

# Multilingualism and National Development

J. B. Disanayaka*

## Introduction

As a Sri Lankan, I feel happy to be in Bangladesh on the UNESCO Mother Language Day for two simple reasons. Firstly, I belong to the ethnic group known as the Sinhalese who trace their origins to your land which was then called '*Vanga*'. '*Vanga*' is the name used in Pali chronicles written in the fifth century ACE.

The Sinhalese call themselves 'Sinhala' because they believe that they descend from a prince named Vijaya who was the grandson of a lion, *sinha*, who roamed the jungles of Vanga. Hence the symbol of the lion is found in our national flag.

Vanga has been identified as the land that covers the modern state of West Bengal and modern Bangladesh. In the distant past, Vanga was not a part of Bharat (India). It was an independent kingdom which was not included among the sixteen *maha-janapadas* (great states) mentioned in the Buddhist literature. I have a feeling that Bengal was made a part and parcel of India by the East India Company of England in the mid-18th century*.

---

*Long before the advent of the British East India Company in India, Bengal was an integral part of the Delhi Sultanate in the medieval age. In the times of the great Mughals, especially from Emperor Jahangir onward Bengal was one of the richest and prosperous *Subahs* (province) of that Empire.— Editor.

"East Bengal region, present-day Bangladesh", writes Prof. Afia Dil, "is an ancient land historically known as Bang (*Vang*) as part of the vast delta of the river Padma open to tidal waves from the bay and

*Professor Emeritus, Department of Sinhala, University of Colombo, Sri Lanka

people used to build *al* (a ridge for protecting against floods) and thus the area came to be known as *Bang-al*. In the pre-Christian era *Rig Veda*, the name appears as *Vanga*. It was during the British period in the mid-18th century that it came to be spelled as *Bengal*. It was known along with Babylon, Egypt and China as an area rich in cross-cultural heritage and inter-cultural contacts by land and sea routes. It is an historical fact that in ancient times the region was not looked upon as part of the so-called Bharat (India) but more a part of Eastern Asia." (*Bengali Nursery Rhymes : An International Perspective*, Adorn Publication, Dhaka, 2010, p. 12)

So today, I am happy to be back in my ancestral land, Vanga, to see my distant relatives.

Secondly, as a child I used to sing a Sinhala folk song that has a reference to a country called '*Bangalade:se:*' which I think is our name for your country even before you began to call your country, Bangladesh. The folk song is a dialogue composed of two questions and two answers. The first question and answer run thus in Sinhala:

*"Olinda tibenne: koykoyde:se?*
*Olinda tibenne: bangalide:se."*
(Where do you find liquorice?
Liquorice is found in *bangalide:se:*"

The second question and answer run thus:

*"Genathhadanne: koykoyde:se?*
*Genathhadanne: Sinhala de:se:"*
(Where do you plant liquorice?
It is planted in *sinhalade:se:*")

This folk song refers to a kind of seed known as liquorice, *olinda*. One wants to find out where *olinda* grows. He is told that *olinda* grows in *Bangla-desh*.

Then he is asked where it will be planted? He is told that it will be planted in *Sinhala-de:se*, the land of the Sinhalese.

I am at a loss to understand the precise meaning of this dialogue. It

implies that liquorice grows in abundance in *Bangali-de:se*, and that it will be brought from there and planted in *Sinhala-de:se*. What matters is that it refers to a land (*de:se*) called *Bangli, Bangla-de:sh*. It also refers to a land called *Sinhala-de:se*, the land of the Sinhala. Sri Lanka has been called '*Sinhala dvipa*' (Island of the Sinhalese) in the past. So this is a folk poem that links our two lands.

Liquorice, sometimes called Indian liquorice (Abrusprecatorius), is a creeper that bears a red coloured seed that is used in a folk game known as '*olindakeliya*', which was once very popular among women of the royalty. Fifty-six seeds are used in this game which is played on a wooden board that has 14 holes in two rows (seven in each row). These seeds were also used as the smallest of jewellers weights. Was there any kind of game in Bangladesh using liquorice?

Today we are here on a mission: to share our experience as two multilingual nation-states in achieving a common goal: national development. We meet here on a day of special significance, the International Mother Language Day, a day that gave birth to a new nation-state, Bangladesh.

In this paper, I will focus my attention on four main themes: language as the most distinctive feature of the human race, language as a symbol of ethnic identity, multilingualism, and finally, national development.

**Language as the most distinctive feature of mankind**

Language is the most distinctive feature of the human race. Language is not a thing but a competence that every average human being possesses. It is a unique competence that gives the speaker a competence to create a novel sentence when he needs one to express his thoughts.

Man discovered this linguistic competence many millennia ago. The discovery of language is one of the three most important revolutions in the history of mankind. The first was the discovery of symbols, that is, the use of something for something else. It paved the way for the discovery of language because language is nothing but a set

of arbitrary symbols. Thirdly, man discovered another set of symbols to stand for the sounds used in language, so that he could take language beyond time and space.

Language gave man a tool that no other living being possesses, making him unique in the animal world. It is the most crucial line that divides man and animal. Language made man the founder of human civilization and culture.

However, we are born without a language. We all cry, scream and yell but we cannot speak. Though we cannot speak, we have the physical and mental capacity to learn to speak. As the infant is fed by its mother, day in and day out, the infant begins to imitate the sounds produced by its mother. The mother and the infant begin to communicate with each other in language. This language is thus called 'the mother tongue' in English. In Sinhala, the mother tongue is called '*mavubasa*' or '*ma:trubha:sha:*'.

The mother tongue that every human being learns first is also called his 'first language'. All other languages that a man acquires later are collectively called 'second languages'. The mother language becomes one's most powerful and efficient medium of communication. Sometimes one's mother tongue is referred to as the language of his or her heart (*hadabasa*).

**Language as a symbol of ethnic identity**

Secondly, the mother language becomes an important symbol of ethnic identity. Neither blood nor physiological features help in the identification of ethnicity. I call myself a Sinhalese, not because of my blood or my facial features, but because Sinhala happened to be my mother tongue. If my mother was Tamil by ethnicity, I would have learnt Tamil as my mother tongue and I would think of myself as a Tamil.

The mother language, being the most crucial symbol of ethnic identity, gives members of that community a sense of pride and self-respect. As a result, any attempt to harm, belittle or disparage the mother language is considered an act of treachery and disrespect. The mother language thus becomes not only the most powerful medium of

communication but also a symbol of ethnic identity.

Modern history tells us of multilingual nations that ran into conflict, disharmony and war because of their language policy. Sri Lanka and Pakistan are two classic examples of this unfortunate episode.

**Multilingualism**

Multilingualism is an English word that has origins in Latin: 'multi' meaning 'many', 'lingua' meaning 'tongue' or 'language', and 'ism' meaning 'the state'. Thus, multilingualism denotes the state of having more than one language in use. On the basis of the number of languages in use, English has created the following set of words: 'monolingual' meaning 'of one language', 'bilingual' meaning 'of two languages', 'trilingual' meaning 'of three languages' and 'multilingual' meaning 'of many languages'.

Prof. David Crystal, in his book *How Language* Works (Penguin Books, 2008) has devoted an entire chapter on 'How Multilingualism Works' (Chapter 63) where he says that "multilingualism is the normal human condition. It is a principle which often takes people by surprise. If you have lived your whole life in a monolingual environment, you could easily come to believe that this is the regular way of life around the world, and that people who speak more than one language are the exceptions. Exactly the reverse is the case" (p. 409)

He continues, "Speaking two or more languages is the natural way of life for three-quarters of the human race. There are no official statistics, but with over 6,000 languages co-existing in fewer than 200 countries, it is obvious that an enormous amount of language contact must be taking place; and the inevitable result of languages in contact is multilingualism, which is most commonly found in an individual speaker as bilingualism" (p. 409)

Multilingual societies, in general, use three kinds of language: first languages, second languages and foreign languages. First languages are the 'mother languages' that one learns first. 'Second languages' are those languages that are learnt after acquiring the first language.

In most countries in Asia, English is the most common second language. Thirdly, there are 'foreign languages', that is, languages that are learnt along with second languages.

"A foreign language", observes Crystal, "in this more restricted sense, is a non-native language taught in school that has no status as a routine medium of communication in that country. A second language is a non-native language that is widely used for purposes of communication, usually as a medium of education, government, or business." (p. 431).

In Sri Lanka, Sinhala and Tamil are first languages: Sinhala used by the Sinhalese, and Tamil used by the Tamils and the Muslims. English is taught as a 'second language' while French, German and Japanese are taught as 'foreign languages'.

Sri Lanka has been a multilingual society from the very beginning of its history. There were, at least, ten languages in use from time to time. For that matter, the Sinhala language itself is the product of multilingualism. It came into being six centuries before the dawn of the Common Era, in our Island kingdom, by the amalgam of, at least, six different languages. What were these languages?

1. *Vanga*

The language was used by Prince Vijaya and his seven-hundred followers who came from Vanga. It was a language that belonged to the Indo-Aryan sub-family of the larger Indo-European family. In the course of time, it gave birth to Modern Bengali and Bangla.

2. Language of the *Yakkhas*

The language was used by Princess Kuveni whom Vijaya married. She was a princess of an ethnic group known as the Yakkha. She bore two children, a son and a daughter, and they grew up in a bilingual family, where the father spoke Vanga and the mother spoke the language of the Yakkhas.

3. Language of the *Pandus*

The language was used by the maidens sent from the city of Southern Madura in India during the time of Vijaya's marriage. According

to our chronicles, Prince Vijaya was requested to marry a maiden of the *ksatriya* caste and messengers were sent to the city of Southern Madura in India seeking the daughter of the king of Pandus. Seven hundred young maidens were also sent from Madura to be married to Vijaya's followers. All these families were also bilingual, because husbands spoke Vanga and their wives spoke the language spoken in Madura.

4. Language of the *Rakkhasas*

The language was used by the ethnic group known as the *Rakkhasas*, who were considered descendants of King Ravana, the king of Lanka who defeated the Indian king, Rama, as narrated in the Indian epic, *Ramayana*.

5. Language of the *Nagas*

The language was used by the ethnic group known as the *Nagas*. Our chronicles record that the Buddha visited the Island to settle a dispute between two Naga kings, *Mahodara* and *Culodara*.

6. Pali

With the introduction of Buddhism in the third century BCE, another Indian language was introduced to the Island. It was called Pali or *Magadhi*. It was the sacred language of the Buddhists. Buddha delivered his sermons in *Magadhi*, the spoken language of Magadha, which had become the lingua franca of the Buddhist world of that time. Sinhalese monks were well versed in *Magadhi*.

In fact, the word of Buddha was committed to writing for the first time in Sri Lanka in the first century BCE. Buddhist monks used the Sinhala alphabet to write *Magadhi*. Pali was used to write commentaries on the Buddha's word, and to compose epics and chronicles. The two main chronicles, *Dipavamsa* (Island Chronicle) and *Mahavamsa* (Great Chronicle) were written in Pali.

The Sinhalese king, *Kashyapa* V, who was well versed in Pali, compiled a Sinhala glossary known as '*Daham Piya Atuva Gaetapadaya*' based on the Pali commentary on '*Dhammapada*' (Buddha's Words of Wisdom).

Even today Pali is used in all religious rites and rituals in the Buddhist temples, in naming Buddhist monks and temples. During the last days of the Island kingdom, Sinhala Buddhist monks were bilingual, for they used Pali when they communicated with Buddhist monks in Myanmar or Thailand.

7. Sanskrit

The lingua franca of Mahayana Buddhists is Sanskrit. While monks of the *Mahavihara*, the main Theravada monastery at Anuradhapura, the first royal capital of this kingdom, used Pali as their lingua franca, the monks of the *Abhayagiri* monastery, a centre of Mahayana, used Sanskrit.

In the fifth century, the Sinhalese king, *Kumaradasa*, composed an epic poem in Sanskrit, known as '*Janakiharana*' based on the story of *Sita* (also known as *Janaki*) as narrated in the Indian epic poem, *Ramayana*.

King Sena I, who lived in the eighth century, translated the Sanskrit work on poetics, '*Kavyadarsha*'of Dandin, into Sinhala verse and called it '*Siyabas Alankaraya*'.

8. Prakrit

Prakrit was another Indo-Aryan language studied by Sinhala scholars. It was among the six languages (*shad bhasha*) that were studied by Sinhala scholars, the others being *Sanskrit, Maghadhi, Apabhransha, Paisachi* and *Sauraseni*.

9. Tamil

Tamil, spoken both in India and Sri Lanka, was in use from the earliest times. The island was ruled by many Tamil (*Damila*) kings, from time to time, beginning from Sena and Guttika, in the second century BCE. The *Mahavamsa* records this episode thus: "Two very powerful Damilas, Sena and Guttika, sons of a horse-shipper, seized Suratissa, the ruler of the earth, and the two of them reigned twenty-two years, justly" (Ch. 21, v. 10-11)

Ten years later, another Damila king, Elara, came into power and

ruled the Island for forty-four years. He was considered one of the most righteous kings who ruled our country.

In the sixteenth century, Tamil was considered on par with Pali and Sanskrit. Tamil spoken in Sri Lanka, however, is different from Tamil spoken in Tamil Nadu in India.

10. Portuguese

Portuguese was the first European language that came into contact with Sinhala and Tamil. The Portuguese introduced not only their language but also their religion, the Roman Catholic religion.

11. Dutch

The Portuguese were followed by the Hollanders, who spoke Dutch. During their period many words relating to the Roman-Dutch law came into the Sinhala lexicon.

12. English

English became the official language of the country since 1815 when the Island became a Crown colony of the British Empire. It remained so until 1956 when English was replaced by Sinhala. The impact of English was two-fold: First, it left behind a brand of English known as 'Sri Lankan English'. Second, it produced a brand of Sinhala, known as '*Singirisi*', which uses English words in Sinhala structures.

Even though Sinhala and Tamil, collectively known as '*swabhasha*' (one's own language or mother language) were made the medium of education, the Tamils were unhappy that their mother language was not given the same official status that was given to Sinhala. This naturally led to political problems, which ultimately ended in a struggle for a separate state. After many years of terrorist war, the mistake was remedied, making Tamil also an official language. Today, English serves as a link language that brings the two ethnic groups together, until they learn Sinhala and Tamil as second languages.

Bangladesh had to face a somewhat similar experience. As Professor

Emeritus Afia Dil says, "The Bengali Muslim leaders had convened and established the Muslim League as a socio-political organization in Dhaka in 1906 to safeguard the interests of the Muslim community. This political party played a leading role in awakening the Muslims throughout India, leading to the Pakistan Movement in 1940, and as a result, the region became the East Pakistan province of Pakistan as an independent nation-state in 1947. But the problems of the region became critically serious because of the over one-thousand mile distance from the capital of the Central Government at Karachi in West Pakistan and, more so, because of some seriously wrong policies of the Government of Pakistan that were seen as a threat to the cultural identity of the people. Their struggle for their rights starting with the Bengali Language Movement soon after independence, but especially after the tragic events of February 21 (called *Ekushe*), 1952, led to the Bangladesh Movement that resulted in the creation of Bangladesh as an independent nation-state in December 1971." (*Bengali Nursery Rhymes*, pp. 13-14)

**National Development**

Sri Lanka is now in the process of building a new nation where all ethnic groups, the Sinhalese, the Tamils, the Muslims and the Burghers, can live in peace, harmony and integrity. In order to achieve national development, steps have been taken by many institutions to build national unity through mutual understanding among speakers of different languages. Accordingly, a Presidential initiative for a Trilingual Sri Lanka has been launched with a view to spread the competence of the two national languages, Sinhala and Tamil, and the link language, English, among the communities at large.

The task of implementing this programme is in the hands of several ministries, departments and commissions. Among the ministries, the most important is the Ministry of National Co-existence, Dialogue and Official Languages. The compilation of text-books, trilingual dictionaries and glossaries of technical words is in the hands of the Department of Official Languages. Complaints regarding the implementation of the Official Language Policy are handled by the Official Language Commission.

# Substantivist Linguistics in the Context of Language Rights

Probal Dasgupta*

## Abstract

*This article provides a contextualization for the substantivist school of thought (within formal linguistics but opposed to the formalistic approach) within the terms of reference familiar from the language rights perspective that stresses the importance of education (especially early education) in the learner's mother tongue. This contextualization takes it for granted that language education, especially what is known as 'language teaching' in general and 'English language teaching' in particular, counts as the dominant enterprise in this domain and that therefore such discourse must address its practitioners.*

Substantivism is a linguistic theory that takes very seriously the relation between spoken language and written language. In the field of linguistics we use the term 'substances' to refer to the phonic medium of speaking and the graphic medium of writing. Conventional approaches in linguistics are formalistic. Their methods encourage a focus on abstract forms, at some distance from the concreteness of spoken conversations. Even though formalists claim neutrality between writing and speech, their attention is focused on texts, not conversation. When they choose to accept spoken material as part of their data, they don't just write it down, they convert it into the written mode, with all that this mode carries. Formalism leads to an abridgement of the content of linguistics, and of its toolkit. It is the resolve to reverse such abridgement that lies at the heart of the substantivist programme.

*Professor, Linguistic Research Unit, Indian Statistical Institute, Kolkata, India

The first major unabridged approach to the study of language emerged in the ancient South Asian tradition of inquiry whose continuations are known as modern linguistics. Panini (ownership of whose legacy is contested between Pakistan and India) focused on formal issues alone in his justly celebrated *Ashtadhyayi* in order to contribute formal devices to what was already an established field of serious inquiry. He could not have imagined that the substantive account of language, conversation and discourse in his uncle Dakshayana's treatise *Samgraha* would disappear from the surface of the earth, and that the community of linguists would allow a drastic abridgement of their field.

By the time Bhartrihari was composing his philosophical and grammatical treatise *Vakyapadiya*, a thousand years later, Dakshayana's *Samgraha* had already become marginal. Bhartrihari tried to bring those concerns back and to overcome the abridgement of linguistic theory. But modern linguistics has steered clear of the literary and social matrix in which language lives and moves. When the linguists of the last couple of centuries have engaged with the social matrix at all, this has been on the basis of an *ad hoc* characterization of 'prestige' as an intangible quality, backed by a socio-political 'elite', that enables certain words and forms to vanquish others in some sort of struggle for cultural 'power' or 'hegemony'. Users of these nebulous terms, to this day, have failed to articulate any viable conceptual structures that help make sense of them. In our times, only extremely abridged versions of linguistics have been available in the libraries.

South Asian culture, however, has proved its resilience in this domain. Spontaneous and innovative work by Haraprasad Shastri, Rabindranath Tagore and Suniti Kumar Chatterji, work that inspired my teacher Ashok Kelkar (who forged a relationship of mutual respect with Chatterji), has led to a new tradition of unabridged linguistics, one that does not try to take words or sounds out of their contexts and lock them into a merely formal game. Within this new tradition, some of us have been working, with some empirical success, to set up sustainable terms of reference for what has been called a substantivist approach to the rigorous study of language, literature and allied phenomena.

At the level of empirical research, evidence in favour of substantivism, and against formalism, has been mounting. Even in the face of evidence, of course, people do not easily change their mind. But it is clear that the study of language is moving towards an unabridged linguistics that will not shy away from conversations with neighbouring disciplines. For activists focused on language rights, it is important to follow these debates.

Specifically, the conversation with colleagues in language teaching, a field of particular interest in the language rights context, needs to be upgraded. One view of language pedagogy treats it as a branch of 'applied linguistics'. On that assumption, the theory of language would count as an autonomously pursued line of scientific inquiry that happens to have applications including language pedagogy. Such a visualization of how the hard work that language teachers do is related to the often not particularly taxing work that we do in linguistics has, entirely unsurprisingly, failed to lead to any worthwhile conversation. Serious linguists – of either the formalist or the substantivist persuasion – have never envisaged such a hegemonic role for the science of language. Linguists have consistently argued that school teachers who handle language and other subjects are practising a difficult art, must find their feet at the level of this practice, and should carry out their own social, cultural and theory-building exercises at some distance from the science of language *per se*.

My own take on this has been that such 'language arts' as language pedagogy, translation, literary reviewing/ commentary/ criticism/ analysis, the fashioning of sustainable language policy in administrative, educational and other domains, and so on, are worthy and autonomous pursuits. Their practitioners, institutionally and individually, should not be asked to subordinate their initiative and self-monitoring to a supposedly omniscient linguistic science. However, the input of linguistic theoreticians does need to reach the practitioners of some of these arts, for them to use as they see fit, along with other relevant input – intellectual, artistic, ethical, logistic and political.

What remains unclear in earlier articulations of this approach is that, while teachers of language need not make a major investment of

intellectual energies in grammatical and lexical study, this argument does not extend to tertiary academics in the language teaching focused variant of, say, the Bangla studies or English studies enterprise. Surely they should be studying linguistics with some diligence. That they are getting away with not doing so has to do with the fact that senior literary colleagues who hire them are not in conversation with linguists, thus creating a traffic jam at the level of academic discourse. The socially relevant upshot is that universities are unable to send coherent messages to those who actually teach languages. In other words, we in academia, locked into various non-conversations, find ourselves in a stymied state of mutual disenfranchisement. Consequently, the input that language teachers rightly keep asking for ends up taking the form of personal messages – such as the present text – whose validity no community of peers is in a position to comment on. When convergent knowledge becomes undeliverable, you are stuck with divergent opinions.

Without further ado, I shall deliver my message now. The way our public discourse encourages us to talk about human speech and writing revolves around these entities – separate languages, called by names such as Bangla and English and Malayalam and French – that we treat as institutional givens. We are also encouraged to assume that a child C is able to learn language L (namely, one of these entities L-1, L-2, L-3...) only because others who already know L are willing to teach L to C; and that when C grows up, her adult knowledge of L consists entirely of material that she has learnt, over the years, from other users in the L speech community. But linguistic research has given us cogent reasons to reject these common beliefs. We know now that a speaker of Bangla or English who is asked, for the first time in her life, to examine such sentences as (a) *John and Bill burnt each other's passports* and (b) *John and Bill told Mary to burn each other's passports*, or their Bangla equivalents (x) *John ar Bill pOroSpOrer passport puRiye phello* and (y) *John ar Bill Maryke pOroSpOrer passport puRiye phelte bollo*, will agree that (a) and (x) are legitimate sentences while (b) and (y) make no sense at all. We know also that this knowledge – elicitable from all adult users of Bangla and English – is demonstrably unrelated to anything ever taught to them in or outside

language lessons. People have far more knowledge of language than they are ever taught, and this knowledge exists at a level that precedes and grounds the institutionally separated entities labelled as 'Bangla' or 'English'.

Formal linguists often call that level 'Universal Grammar' (please note that, within the larger field of 'formal linguistics', substantivism and formalism are two of the schools of thought). Perhaps more needs to be said. One characterization portrays Universal Grammar as part of every human child's innate endowment. On that approach, the expectation is that biology will, some day, explain how this fact about the human genotype has come about. Regardless of whether this or any other comment at such a general level will prove sustainable, linguists have demonstrated that much of what child C picks up when she acquires "language L" associated with "society S" belongs to Universal Grammar, the general human endowment – not to anything that society S has built into its pedagogy that initiates C into S's culture. Thus, the commonly held view that discrete human societies S-i, S-j, S-k are associated with discrete languages L-i, L-j, L-k represents an excessively indulgent attitude to the fairy tales – to the culturally constructed narratives posing as reality – that children in those societies listen to as they grow up. That we speak in terms of discrete languages English, Bangla, Malayalam represents the kind of surrender to local mythologies that can be dramatized by imagining a world in which people do not call England England, but call it Elizabethland as long as Elizabeth rules and equally quaintly change its name to Charlesland from the date of her handing the throne over to Charles.

Linguists have shown that discrete languages are as mythological as thrones. Mythologies have their uses – we may find the royal family of England very congenial indeed when one of its scions is all set to marry a woman of mixed racial heritage – but we would distort our perceptions if we were to give them so much space on our maps. Linguists have also shown that our touching belief in the power of teaching fails to see the limits of teaching. Humans are teachable only because they have a tree in their head whose flowering takes the form of what we call knowledge, and "teachers" help these

trees to flower and bear fruit. The process of "giving" knowledge – assumed in all our discourse of teaching someone and learning from someone – is in very large part an optical illusion. To take this optical illusion seriously is naive empiricism; linguists have done more than practitioners of any other discipline to demonstrate that naive empiricism is an untenable theory of how knowledge arises in human minds.

Perhaps you have begun to ask how these ideas help you to make sense of the overall enterprise to which you belong. But surely you see, from the foregoing exposition, that 'the teaching of L' (where L is Bangla, or Chakma, or Urdu, or English, or German) is a phrase enshrining two fallacies? Have I failed to convey to you the claims made by the community of grammarians – that no such bounded entity as 'Bangla' or 'English' can be identified, for discrete languages do not exist, and that the 'teaching' of a language is an optical illusion? In other words, please ask yourself what makes you so sure that you know that there is such a thing as French or such a thing as language teaching. If you have arguments to counter the demonstration above (the one based on (a), (b), (x) and (y)), please formulate them; then we can have a useful debate. If you have not formulated such arguments, please be patient and hear me out.

Obviously, on a myth-loving planet on which people do keep calling their countries Elizabethland and Charlesland, theoreticians who have seen through the charade, but who have failed to persuade the rulers to abandon the quaint practice of visualizing countries through their queens and kings, are compelled to keep using these names to humour their myth-drugged neighbours. We linguists need to reach you and have no choice but to use terms like English and Bangla for what you, dear members of the public, call English and Bangla.

When we question these names, what indeed are we suggesting? You may be asking this legitimate question as you read me. What's in a name? Surely we are not asking you to use other names instead of English or Bangla or Malayalam?

No, we are urging the public and its rulers to see that the knowledge

of language that grows in the minds of its speakers eludes your naming practices. This is like the fact that if you build a house and if you and the municipality agree to call it 25 Ballygunge Boulevard – yes I know there is no such road, that is part of my point – then it does not follow that a tree in your garden or a mango from your tree can be usefully called a 25 Ballygunge Boulevard tree or mango. Your address may help sort out ownership issues, but the address has nothing to do with any fruit, any stone, any bird there at a fruitological, stonological, birdological level. Likewise, there are no relations between English verbs and English direct objects. There is nothing phonetic to say about how English vowels and English consonants hang together.

We are not urging you to abandon the habit of naming your streets or numbering your houses, or of making ownership claims on a body of literature by calling it Bangla or English writing. We are asking you to see how tenuous a matter such ownership is bound to be, and to be more realistic about the give and take surrounding the mangoes that grow in your garden at 25 Ballygunge Boulevard. Watch the flow of fruits and appetites, and be reasonable. We are urging you not to get hung up on the claim that these mangoes are yours or theirs, or on the claim that *sepoy* is an English word while *shipahi* is a Bangla word.

Please see if you can build agreeably hospitable homes rather than fiercely bounded fortresses. We understand that there are going to be addresses for houses, and names for languages. Amen. Can we, however, persuade you to open up these addresses and names? Will you give unto nature what is nature's, if we give unto your Caesar what is Caesar's?

Thus, suppose I grant, for argument's sake, your visualization of a boundable Bangla or English or Tamil or Urdu, and your right to build a proprietary wall around it and claim ownership on everything within your fortress. I even grant that there is such a thing as "teaching" in your sense of the term. In return, will you help me to build a couple of little fortresses where you have been refusing to let any of us do so?

I am like other users of the neutral 'springboard' language (a reference to pedagogic experiments under way in some British schools) designed to promote open, cross-barrier lexical calibration – Esperanto, whose word-structure, as I show in my 2011 book *Inhabiting Human Languages: The Substantivist Visualization*, does for the notion of Universal Lexicology the work that the apparatus of generative syntax does for Universal Grammar – in wishing to have a Bangla fortress, a Hindi fortress, an English fortress, a Chinese fortress. This is because educationist friends tell me experiments show that, if a child gets all of her primary and most of her secondary education through the 'first language' (the language whose walls she is at home with) as the medium of instruction, then she actually grasps the content of such schooling and grows up cognitively healthy. In contrast – studies show – a child whose school uses the immersion method, snatching her away from the verbal environment of her home and forcing her to learn in a language not used in her family, grows up far less secure in her grasp of what the school tries to teach her.

Dear readers, you are reading an academic article in English, and have perhaps done a lot of advanced reading, even looked at journals at the language-education interface? Perhaps you have even read my educationist friends or been to their seminars, and can recognize them from my allusions? You then know, surely, that other friends of yours who say they disagree never get around to refuting their arguments, but keep running away from debates on these issues? I conclude that children from Santali-speaking homes, for example, need a Santali-first system of schooling and teachers who will show them how to take pride in the language they speak. Will you help me to build such systems for this subcontinent's rich array of indigenous languages in return for my willingness to humour your desire to imagine a world of language-fortresses, and to help you to fashion what you may wish to call an approach to the teaching of English within a framework of applied linguistics, and derivatives approaches to the teaching of other languages in a world that allows the teaching of English to lead the way in this domain?

You think I am flippantly changing the subject? Gentle reader, I have

seldom been more serious, and seldom stuck to the subject more closely. A. K. Ramanujan, shortly before he passed away, spoke to me of his firm belief that the impulses of modernity that had once led South Asians to wield English as an instrument of their own would also help them find their way back to their languages very soon. He regarded these as twin sectors of the same enterprise and was sure that even those South Asians who had become entirely English-focused would soon see the point. Are Anglophone South Asians going to prove to be a far less perceptive community than Ramanujan had hoped?

Oh, you thought I meant an education devoid of English, did you? To be sure, a reasonable education for children of the indigenous peoples of South Asia has to connect not just with the idiom of the home but also with whatever winds of the world need to blow in a particular region. A regional language of wider communication, and obviously English, will have to form part of the diet that schooling must provide to our indigenous peoples. But the educational experiments show that only if the academic content is provided over the first few years in the first language and later in a judiciously created bi- or multilingual cuisine, suited to the individual learning styles of the children, can healthy cognitive growth be ensured (Mohanty et al. 2009). Furthermore, the school needs to introduce regional and global languages of wider communication in very carefully calibrated ways if the fragile fabric being woven is not to be damaged by callous and thoughtless handling.

Well, of course you are wary of such proposals after seeing what happened in places where wonderful results were promised but never surfaced. I understand your anxiety, and your indignation; I recognize the need for a long-term post mortem process. What happened in West Bengal, at least, has to do in large part with the teaching of English initiated at the secondary school level. In a scenario where such teaching is seriously planned, and the teachers who deliver it are given thoughtful training and equipped with the necessary tools, the policy format that West Bengal tried to implement in the eighties does not become synonymous with failure. The failure that hit some of us in West Bengal was in large part a cascade effect, and you will never understand it if you do not take a

closer look at what has or has not been happening in the premier English language teacher training institutions of India, far from Kolkata, but with grave consequences for the cognitive health of West Bengal's children.

But this is only part of the diagnosis we need. Part of the problem lies in the many educational milieux of South Asia where the discovery of learning – and the corresponding loss of faith in vertical teaching – has yet to occur. Knowledge is not created by major authors of books and journal articles and disseminated in watered down versions through didactic pontifications in classrooms where 'good students' take notes to be memorized – contrary to convictions that the elite of South Asia and its descendants living in the west abroad have never outgrown. The emergence of knowledge takes place, when it does, in the minds of learners as they learn, and teachers can help only if they are practised in the circumspect and indirect maieutic art of bringing such learning about. Major books and journal articles are important, but only as sources of inspiration; to imagine that their content can be disseminated in any direct sense is to seriously misread the traffic of cognition.

Only if our public begins to understand this, and to take seriously what they understand instead of getting frothily agitated over non-issues, will there be zero tolerance for classrooms where one teacher is asked to teach more than twenty-five children at a time. Obviously teachers have no opportunity to bring out anybody's learning potential in absurdly overpopulated classrooms.

I suppose you will tell me you have heard this before. Well, have you, really? Influential voices pontificating recently about the educational scene in at least India – and I have been listening to them with some care – seem not to recommend zero tolerance for overpopulated classrooms. The usual sermon skips fifteen steps in the argument and mentions the abysmal poverty that causes rural schools to function with just one teacher and a couple of hundred children, and what have you. Now, we all agree that under emergency conditions, which prevail all the time in many rural settings in contemporary South Asia, teachers are forced to take emergency measures in order to keep their cool, with often terrible consequences

for themselves and their students. And we do need to find a way out of this disaster. But how do you expect to get anywhere on that front if you do not even begin to diagnose, in your daily griping, what is unacceptable about the middle class urban schools whose administrations you are willing to pamper in order to get your children into what you still conceptualize as a rat race? If our urban public, by continuing to be thoughtless, keeps itself chained to the same emergency level as our lamentably crisis-laden rural milieux, and if articulators of public issues who speak to captive audiences miss every opportunity to advise our modern prince to change things in the cities so that our city-bred teachers can make a difference in the countryside, then where exactly do you expect the positive transformation to get started?

Oh I see, you now complain that the communication with me will break down because I am losing my cool, are you? Well, your practice in the art of complaining is of course boundless, and I immediately grant your point. Okay, okay, I lost my cool, please stop conversing me forthwith. There is this non-linguist friend of mine that you seem willing to talk to – why not move to his writings instead, shall we? I do not even need to name him, many of you will recognize him from my allusions.

In his most celebrated writings this friend of mine writes that the greatest wrinkle in language is that it enables us to imagine what is known not to be real and in some cases not even to be possible. Those writings are in English, but he has published in Bangla as well, and manages a non-fortress linguistic home, friendly and open to all comers. He is known for keeping his cool; I am sure you will enjoy talking to him. Permit me to suggest that you take a leaf out of his book. He spoke of imagining. When your forefathers moved into English, claiming to be using it against the Englishmen then in power, they were imagining a world that used that language but was moving towards demonstrably fair and sustainable ways of ensuring linguistic, intellectual and affective welfare. Inheriting as you do the legacy of such forefathers – and of such a foremother or two as well – you are surely able, and may someday be willing, to imagine an open space, with the fortress of English language teaching

replaced by a mingling of Englishness with humanness, and endowed with a resolve to make English a means of inclusion rather than exclusion. Without such a resolve, the field of language rights is doomed to remain marginal in serious and implementable policy-making. If my friend's words move you into such a cosmos, it will not matter that you listened to his words and not to mine!

## Bibliography

Dasgupta, Probal. 2011. *Inhabiting Human Languages: The Substantivist Visualization.* New Delhi: Samskriti and the Indian Council of Philosophical Research.

Mohanty, Ajit K.; Panda, Minati; Phillipson, Robert; Skutnabb-Kangas, Tove (eds.). 2009. *Multilingual Education for Social Justice: Globalising the Local*. New Delhi: Orient Blackswan.

# Mother tongue – Root of all Culture

Dr. K. Sreenivasarao*

There was a time when everyone was very proud of one's mother tongue, motherland etc. Today, it has become fashionable not to speak one's mother tongue.

The life, the force, the vitality and the language we inherit from our mothers are the builders of bodies and personalities. Very aptly the language we imbibe from our mothers is called first language. Not only numerically or chronologically it is a first language but also it is the first language with which we start identifying ourselves and the world around us.

Mother tongue is a tool, a nerve, a chord that connects one to the culture in which one is born and enables one to express one's feelings, emotions and thoughts. So, in more than one way, one's mother tongue is the first step one takes in life.

Medical and other scientific researches continue to establish the primacy and supremacy of mother tongue over the borrowed languages. If one were to acquire a language other than one's mother tongue at infancy, it stutter's one's ability to develop thought process rapidly, enhance spatial awareness quickly and communicate at ease with the people around.

So, it would not be an exaggeration if I were to say that one's mother tongue provides one his or her cultural identity. A child connects to his parents, family, relatives, culture, history, identity and religion through his / her mother tongue. The case studies of children who are adopted at an early age and the very young immigrant children

*Secretary, Sahitya Akademi, Rabindra Bhavan, New Delhi, India

who find them in an alien, hostile land facing identity crisis prove the protective side of the mother tongues.

So, it is our duty to protect mother tongues which protect us, guide us, shape us and serve us. But, today, in the urban spaces at least, it has become fashionable to impart alien languages to the children at infancy without even a single thought. It is fast becoming an epidemic, the epidemic that is threatening to engulf and distract millions of children.

The scenario also fast threatening to become a serious linguistic environment issue, as the decline in the native speakers will eventually lead to the death of languages. In the case of Indian sub-continent it is all the more sad and needed to be addressed faster because, most of the Indian languages are ancient and rich in cultural and literary heritage.

With the death of the language, not only the communication device gets lost but also vast amount of information, history, culture, scientific data about the world and the practices of religion get lost forever.

Mother is a giver of life and mother tongue is a carrier of culture. The connection between these two is inseparable.

Rapidly advancing technology and fast changing lifestyles thereby are in the process of consuming us. The culture of contemporary society is one of a mirage. No doubt certain specific languages are the best connectors in the globalized world. But, treating any language merely as a tool for communication will be to our peril.

For the sake of posterity at least we all should reach out, buck the trend and restore our mother tongues. For, culture lost is a life lost and mother tongues are the very roots of our culture.

# Mother Language Based Education: Digitisation of what and for whom

Dr. DP Pattanayak*

In 1953, the UN issued a declaration supported by linguistic, psychological and sociological research and signed by 200 heads of States that Mother tongue is the best medium of elementary education. No country has fully implemented it as of date.

The survival of the Universe depends upon the protection of its diversity. What bio-diversity is to nature, language diversity is to human society. Although the universe with 6000 languages is diverse, it is divided in two parts: One Part, Economically, Politically, most powerful Mono-Modal Society, where as the other is Multiethnic, Multilingual, Multicultural Multi-Modal society. The 1st World which dictates the development paradigm to the world results in development deficit in the rest of the world. The social inequity results from this profit oriented corporate economy.

The two communist giants, USSR & Chaina and their satellites, competing for technology which their Western Counterparts mimicked and reinforced their consumerist life style. While adopting trendy innovations they lost sight of whether the peoples " lives could be enriched without erasing their cultural heritage and whether the needs of the recipients are better served by non-trendy low -and –old-technologies. They have reached the dead end.

India with 1.25 billion population, the 2nd largest populated country, is the best example of universal diversity with its 3000 mother tongues, 4000 castes and communities, 4000 religious faiths and believe, 65000 plant varieties and 45 000 animal varieties is one of

*Founder Director, Central Institute of Indian Languages; Retired Additional Secretary, Government of India

the socially iniquitous countries where 79% wealth is accumulated with 1% of the population. Mother tongue is not only the medium of grassroots communication and society formation, It is the best indicator of social inequity.

Education can act as a powerful tool for reducing poverty and unemployment, improving health and nutritional standards, and achieving a sustained human development-led growth. (World Bank 2004). Amartya Sen (2007) emphasizes inclusive rather than divisive growth strategies. But the attitude towards mother language determines the structure of education has not been properly investigated and sufficiently explained.

The colonized third world countries of the world which are multilingual and multicultural, were told that their languages were worthless as languages of knowledge and of development and the only language of knowledge and development is the colonial language. Consequently in India. English was imposed as the language of knowledge and development Regional languages are downplayed and mother languages were ignored. Now we are treating them as endangered languages and trying to retrieve them, Digitization has became a handy equipment for this purpose.

There language policy suited the education system they promoted, which would produced limited number of educated who would help them in governance of the sprawling empower and large number of illiterates and school dropouts. As a result, the multilingual based of the country began to shrink. Nacaulay's predication that the system would produced generations who would be Indian's by birth but English in manners and moral proved to be true.

In the absence of Language Policies, mother language is given diverse treatment in different states. In most cases, the majority mother language is treated as the mother language of the State and the minor and minority languages are ignored. Sometimes, mother languages are treated as second or third languages in the education system. We have adopted a new term "Mainstreaming" in our education vocabulary. The underlying assumption is disrespect to the mother languages and through mainstreaming we elevate their status.

In language instruction, bilingual and multilingual education are strategies, The West accepted Bilingualism in 1961 and Multilingualism in 2010. Since then discussion on these strategies have percolated to the rest of the world. Mother language based multilingual education found favour in Asia and Africa and many research reports are available on the subject.

Multilingual Education is not a wakeup call for rectifying deficiencies in our education system. It is no the result of a policy. India has no language policy. After the adoption of the Three Language Formula, the Indian education system should have been declared a multilingual system. That did not happen. Those who were promoting multilingual education had christened the program as mother tongue based multilingual education. When Odisha and AP followed by Jharkhand and Chhattisgarh wanted to upscale their tribal education by introducing mother tongue based multilingual education that multilingual education came to the lime light, multilingual education came to be synonymous with tribal education or minority education and was considered inferior to the general education.

There is tremendous confusion among intellectuals and bureaucrats about multilingual education. Both seem to agree that many languages are divisive and problematic. Therefore there is no need to learn many languages. If they have to be learnt, they can be spread over the system. Since English is the only language of knowledge and development, it has to be taught from KG to PG. Teaching other languages are for form sake.

While the outcome of the mother tongue based multilingual education program was yielding positive results, the duplicity of governance in supporting early English education pushed it towards decay. Tribal schools were closing down due to non-availability of students and teachers. Children were wrenched from their parents, from their environment and from their cultural settings and were taught English in AC buildings in city schools. No wonder that they were neither good at their mother tongue nor at English.

Tribals' live in areas rich with mines and minerals. They live in

inhospitable mountainous areas in deep forests surrounded by streams and rivers. They live in small communities. We need their trees, stones and water for development, We need the mines and minerals for industry. We need the streams and rivers in mountains for generation of electricity. We need the stones for building dams, roads and the trees for building houses and household goods. Therefore they need to be displaced and dispossessed. Under such trying circumstances there is no wonder that they would be the first victims of the colonial conspiracy and give priority to English rather than the majority state language and the minority mother tongues.

Social equity and qualitative education is under mortgage among all the stake holders.

Degitisation has many dimensions, Digitisation of manuscripts, classical texts, Anthologies and archiving them is meant for preservation of the language. Research on text to speech and speech to text is a natural extension of the programmer. Capturing oral, folk literature, degitising and storing them is another dimension. Preparing corpus from as many domains and disciplines as possible captures the totality of language. This with help information retrieval and extraction, web search, text summarization, text categorization, sentiment analysis and machine translation, spelling correction, natural language generation, speech recognition, speech synthesis, dialogues systems are some of the possibilities of research and application of digitization. These are meant to capture and preserve the linguistic tradition.

Mother language is the key to development. It is the key to sustaining democracy. It is the language of peace, non-violence and fraternity. It is the language which maintains diversity. Unless all languages are bound by mutual respect and complementary relation, peace and prosperity will be lost and survival of the universe will be at risk.

# আলোকচিত্র
# আর্কাইভ
# থেকে

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও অন্যান্য
ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি ১-মিনিট নীরবতায় শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করছেন শিক্ষাসচিব জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন পদ্মশ্রী অধ্যাপক ড. অনবিতা আব্বি (ভারত)

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী, মহাপরিচালক, আমাই

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন বিয়েট্রিস কালডুন, হেড অ্যান্ড রিপ্রেজেন্টেটিভ, ইউনেস্কো, ঢাকা অফিস

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সুধীবৃন্দ (একাংশ)

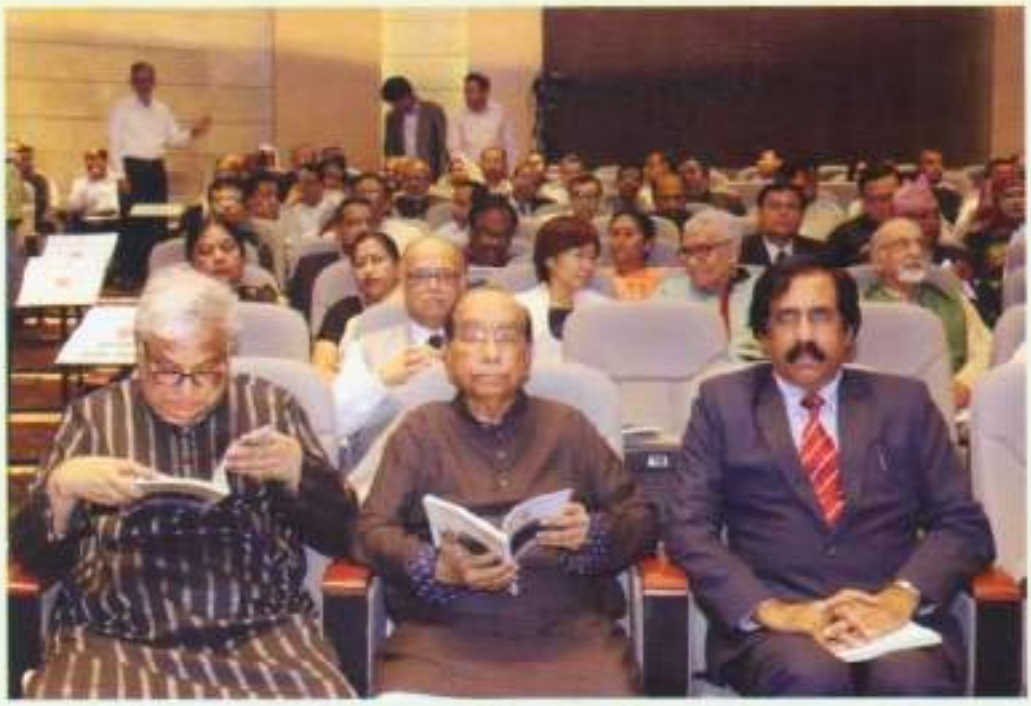

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সুধীবৃন্দ (একাংশে)

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সুধীবৃন্দ (একাংশ)

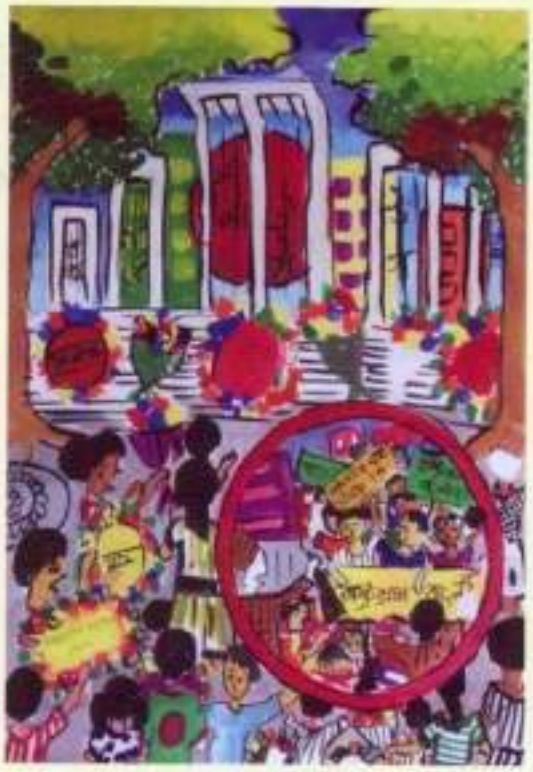

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ঘ গ্রুপে (৯-১০ম) প্রথম পুরস্কার বিজয়ী মেহজাবীন তাসনিম খান, ৯ম শ্রেণি, উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

ঘ গ্রুপে (৯-১০ম) দ্বিতীয় পুরস্কার বিজয়ী মারজান ইসলাম এথিনা, ৯ম শ্রেণি, ভিকারুন নিসা নূন স্কুল

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায়
গ গ্রুপে (৬ষ্ঠ-৮ম) প্রথম পুরস্কার বিজয়ী আফরিনা ফারহানা খান, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

গ গ্রুপে (৬ষ্ঠ-৮ম) দ্বিতীয় পুরস্কার বিজয়ী নুসরাত জাহান (নুহা), ৭ম শ্রেণি, বটমলী হোম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায়
খ গ্রুপে (৩য়-৫ম) প্রথম পুরস্কার বিজয়ী শাহাদাৎ হোসেন, ৩য় শ্রেণি, ম্যাপল লিফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল

খ গ্রুপে (৩য়-৫ম) দ্বিতীয় পুরস্কার বিজয়ী শাযাহ সুলতান সপ্তর্ষী, ৩য় শ্রেণি, হলি ক্রস স্কুল

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায়
ক গ্রুপে (প্রাক প্রাথমিক-২য়) প্রথম পুরস্কার বিজয়ী মির্জা আযান, উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

ক গ্রুপে (প্রাক প্রাথমিক-২য়) দ্বিতীয় পুরস্কার বিজয়ী আফরিন হোসেন, হাজারীবাগ গার্লস স্কুল

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় দূতাবাস পরিচালিত স্কুল থেকে: প্রথম পুরস্কার বিজয়ী Saadat Sikander Khan, ২য় শ্রেণি, দি আগা খান স্কুল

দূতাবাস পরিচালিত স্কুল থেকে: দ্বিতীয় পুরস্কার বিজয়ী Samina Ali Hussain, ২য় শ্রেণি, দি আগা খান স্কুল

## আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন করেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভবনের বহির্দৃশ্য